চতুর্থ অধ্যায়

নতুন যুগের শিশু ও কিশোর সাহিত্যের প্রধান লেখকবৃন্দ (১৮৯০-১৯৪৭)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

(১)

সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) শিশুসাহিত্যের লেখকরূপে নিজস্ব প্রতিভার যথার্থ সুবিচার করেছেন কিনা—এবিষয়ে বহুজনের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। একদলের মনে হয়েছে তিনি ছোটদের জন্য যা লিখেছেন, সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ। 'শিশু', 'সে', 'গল্পসল্প', প্রভৃতি গ্রন্থে তাই শিশু মনস্তত্ত্বকে আচ্ছন্ন করেছে দার্শনিক রবীন্দ্রমনন। ছোটদের তুলনায় তা অধিক পরিমাণে বড়োদের মনোজগতের সামগ্রী। মোটা দাগের ছেলেমানুষি বা জলদগম্ভীর উপদেশের অভাব[১] রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যে লক্ষ করা গেছে বলেই হয়তো ছোটদের রবীন্দ্রসাহিত্য চিনতে অসুবিধা হয়েছে। কিন্তু ছোটদের মন-মর্জির সতর্ক খোঁজখবর রাখেন যাঁরা, তারা উপলব্ধি করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রখর পর্যবেক্ষণ শক্তি, সহমর্মী অনুভব ও শিশুসুলভ বিস্ময় নিয়ে পৌঁছে গেছেন ছোটদের কাছাকাছি। ছোটদের মনবুঝে, তাদের মতো করে সাহিত্যবিশ্বকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে দিয়েছেন তিনি। তাই অপরপক্ষের সমালোচকদের উপলব্ধিতে ধরা পড়ে রবীন্দ্রনাথের শিশুবিশ্বের সারল্য; তত্ত্ব কিংবা রূপকের ইঙ্গিত উপেক্ষা করে রবীন্দ্রসাহিত্যবিশ্বে শিশু-কিশোরের সপ্রাণ উপস্থিতি। অবশ্য শিশুদের জন্য লেখা হলেও, লেখকের উপলব্ধির সঙ্গে ছোটদের অভিজ্ঞতার জগৎ খাপখায়না বলে, ছোটদের জন্য রবীন্দ্রনাথের লেখা কিছু রচনা শিশুদের উপযোগী নয়। বড়োদের চোখ দিয়ে দেখা বলেই ছোটদের জগৎ সবসময় ছোটদের থাকে না। বড়োদের ভিতরের চিরন্তন শিশুটিই তখন প্রধান হয়ে ওঠে। তৎসত্ত্বেও তিনি শিশুসাহিত্যের একজন মননশীল কর্মী। নিজে শুধুমাত্র ছোটদের জন্য অজস্র লেখা লিখেছেন, তাই নয়, অন্যদের উৎসাহিত করেছেন শিশুসাহিত্য রচনায়। শিশুসাহিত্যের উপাদান উপকরণ সংগ্রহে তাঁর উদ্যোগ সমকালীন লেখকদের প্রাণিত করেছে শিশুসাহিত্য জগতে পৌঁছুতে।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কৃতি সন্তান রবীন্দ্রনাথের শৈশবে বাংলা শিশুসাহিত্যেরও বাল্যকাল ছিল। ছোটদের বইয়ের অভাব লক্ষ করে যোগীন্দ্রনাথের 'হাসি ও খেলা'র সমালোচনা করে 'সাধনা' (ফাল্গুন, ১৩০১) পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—

> *"... বইখানি ছোট ছেলেদের পড়িবার জন্য। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। ছেলেদের জন্য যেসকল বই আছে তাহা স্কুলে পরিবার বই, তাহাতে স্নেহের বা সৌন্দর্য্যের লেশমাত্র নাই, তাহাতে যে পরিমাণে উৎপীড়ন হয় সে পরিমাণে উপকার হয় না ...।"*

নীতিকথার জগদ্দল পাথরের চাপে রুগ্ন শিশুসাহিত্যের বন্ধন মুক্তির উদ্দেশ্যে সমকালীন সাহিত্য পত্রিকাগুলির নব উদ্যমে সামিল হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'বালক' পত্রিকায় ছোটদের জন্য নিয়মিত লিখেছেন তিনি। পাশাপাশি লোকসাহিত্যের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা শিশুসাহিত্যের বিপুল সম্ভবনার কথা উপলব্ধি করে মনোযোগী হয়েছিলেন ছেলে ভুলানো ছড়া সংগ্রহে। এই প্রাচীন ছড়াগুলি সংগ্রহের

প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে জানিয়েছেন—

> *"সদ্যঃকর্ষণে মাটি হইতে যে সৌরভটি বাহির হয়, অথবা শিশুর নবনীতকোমল দেহের যে স্নেহোদ্‌বেলকর গন্ধ, তাহাকে পুষ্প চন্দন গোলাপ-জল আতর বা ধূপের সুগন্ধের সহিত একশ্রেণিতে ভুক্ত করা যায় না। সমস্ত সুগন্ধের অপেক্ষা তাহার মধ্যে যেমন একটি অপূর্ব আদিমতা আছে, ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্যে তেমনি একটি আদিম সৌকমার্য আছে; সেই মাধুর্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে, তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ সরস এবং যুক্তিসংগতিহীন। শুদ্ধমাত্র এই রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই আমি বাংলাদেশের ছড়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।"*

এই সমস্ত ছড়া ব্রাণ্ড 'শিশুসাহিত্য' নয়। তৎসত্ত্বেও শিশুসাহিত্যের লক্ষ্মণাক্রান্ত ছড়াগুলি যে ছোটদের বিশেষতঃ শিশুদের মনোযোগ আকষর্ণে সক্ষম, তা রবীন্দ্রনাথ বিলক্ষণ জানতেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ছোটদের এই মনোযোগের কারণেই গ্রামীণ লোকসাহিত্য, ভবিষ্যৎ শিশুসাহিত্যের অপরিহার্য উপাদান হয়ে উঠবে। তাই নিজে লোককথা সংগ্রহের জন্য উৎসাহিত করেন তাঁর অনুজদের। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, উপেন্দ্রকিশোর মনোযোগী হন লোকগল্প ও ছড়ার সাহিত্যিক পুনর্নির্মাণে। 'টুনটুনির বই' (১৯১০)-এর ভূমিকায় উপেন্দ্রকিশোর লোকগল্পকেই তাঁর গ্রন্থের উৎসরূপে চিহ্নিত করেছেন—

> *"সন্ধ্যার সময় শিশুরা যখন আহার না করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িতে চায়, তখন পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলের স্নেহরূপিনী মহিলাগণ এই গল্পগুলি বলিয়া তাহাদের জাগাইয়া রাখেন। সেই গল্পের স্বাদ শিশুরা বড় হইয়াও ভুলিতে পারে না। আশাকরি আমার সুকুমার—পাঠিকাদেরও এই গল্পগুলি ভালো লাগিবে।"*

'বাল্যগ্রন্থাবলী' সিরিজের পরিকল্পনা করে রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ছোটদের জন্য লেখার আহ্বান জানান। রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী যে রূপকথা সংগ্রহ করেছিলেন, তা-ই অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল' (১৮৯৬) এর উৎস। মৃণালিনী দেবী রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে রূপকথা সংগ্রহে ব্রতী হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুমার ঝুলি'র ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য মহিলাদেরও যে রূপকথা সংকলনে উৎসাহ দিয়েছিলেন সে কথা জানিয়েছেন। সুতরাং লোককথা ও রূপকথা সংগ্রহ করে বাংলা শিশুসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সংগঠকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। পাশাপাশি তাঁর বহু রচনায় এই রূপকথা ও লোককথার জগৎ অনুপ্রবেশ করেছে।

লোকজীবনের প্রতি বিশেষ মনোযোগের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যে বন্ধনমুক্ত মনের সুদূরের প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ অনুভব করা যায়। জীবনস্মৃতিতে ভৃত্যরজকতন্ত্রে বন্দি

রবীন্দ্রনাথের শৈশব ও বাল্যজীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। বন্দি শিশুমন মহাশূন্যের পথে ভেসে যেতে চায়—বাইরের প্রকৃতি তাকে আহ্বান করে। জীবন থেকে এই সত্য শিখেছেন বলেই রবীন্দ্রশিশুসাহিত্যে বন্ধনমুক্তির দক্ষিণাবাতাস। শিশুর সুপ্ত ইচ্ছাগুলি ডানা মেলেছে রবীন্দ্রকাব্যে। শিশুদের প্রাণবন্ত চঞ্চলরূপ তিনি উপলব্ধি করেছেন। তাই তাঁর শিশু শুধু ছেলেমানুষ নয়; রবীন্দ্রনাথের শিশু ধ্যানতন্ময় শিশুভোলানাথ।

রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যে একধরণের অন্তর্লীন বিষাদ লক্ষ করা যায়। 'শিশু', 'শিশুভোলানাথ'-এর অধিকাংশ কবিতায় শিশু তার মায়ের কাছে অজস্র প্রশ্ন করে। সেখানে মায়ের সঙ্গে আসন্ন বা কল্পিত বিচ্ছেদ বেদনায় সে অস্থির। শিশুর এই বিচ্ছেদবেদনা রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসঞ্জাত। তিনি শৈশবে স্বয়ং মাতৃস্নেহ থেকে প্রায় বঞ্চিত। কবির ব্যক্তিগত জীবনের এই একাকীত্বের অনুভূতি বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে তাঁর শিশুসাহিত্যে। একই সঙ্গে স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর (১৯০১) তাঁর মাতৃহারা সন্তানদের একাকীত্বের যন্ত্রণা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তাঁর শিশুসাহিত্যে এই প্রিয়বিচ্ছেদের সুর বারবার শোনা গেছে।

ছোটদের জন্য রবীন্দ্রনাথ যেমন লিখেছেন, তেমনি বড়োদের জন্য তাঁর অনেক লেখাতে ছোটরা অনাবিল আনন্দ খুঁজে পায়। ছোট ও বড়ো—এই দুইশ্রেণির জন্য লেখা সাহিত্যের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যে। ছোটদের জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রথম লেখেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকায় (১৮৮৫)। এই পত্রিকায় তাঁর বিখ্যাত 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান' নামে বিখ্যাত শিশুপাঠ্য কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এরপর 'সখা', 'মুকুল', 'সন্দেশ', 'মৌচাক', 'রামধনু', 'মাসপয়লা', 'রঙমশাল', প্রভৃতি পত্রিকায় ছোটদের জন্য লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। ছোটদের জন্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর লেখাগুলি হলো—'নদী' (১৮৯৬) 'শিশু' (১৯০৩), 'শিশুভোলানাথ' (১৯২২), 'সহজ পাঠ' (১৯৩০), 'খাপছাড়া' (১৯৩৬), 'ছড়ার ছবি' (১৯৩৭), 'ছড়া' (১৯৪১), 'সে' (১৯৪১), 'গল্পস্বল্প' (১৯৪১)। এছাড়াও বড়োদের জন্য লিখিত গল্পগুচ্ছের কয়েকটি গল্প, 'লিপিকা'র কয়েকটি রচনা, এবং কয়েকটি নাটক ও কবিতায় রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

(২)

ছোটদের জন্য রবীন্দ্রনাথ দুটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন— 'শিশু' (১৯০৩) ও 'শিশুভোলানাথ' (১৯২২)। এছাড়াও ১৮৮৬ সালে 'নদী' বলে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকশিত হয়। কবিতার পাশাপাশি ছোটদের জন্য তিনি তিনটি 'ছড়া'র সংকলন প্রকাশ করেছেন। এগুলি হলো 'খাপছাড়া' (১৯৩৬), 'ছড়ার ছবি' (১৯৩৭) এবং 'ছড়া' (১৯৪১)। চরিত্রের দিক থেকে এই কবিতা ও ছড়াগুলিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণিতে থাকবে গম্ভীর চালের কবিতা। দ্বিতীয় শ্রেণিতে রয়েছে হাস্যরসাত্মক কবিতা। প্রথম শ্রেণির মধ্যে 'শিশু' ও 'শিশুভোলানাথে'র অধিকাংশ কবিতাগুলি স্থান পাবে। দ্বিতীয় শ্রেণিতে থাকবে ছড়া জাতীয় রচনা। কখনও কখনও

আজগুবি-উদ্ভটরসের ধারায় সিক্ত হয়েছে এই কবিতাগুলি। 'শিশু', 'শিশুভোলানাথ' কবিতায় শিশু তার নিজের জবানীতে মায়ের কাছে নিবেদন করেছে তার অফুরন্ত কৌতূহল ও ইচ্ছেকুসুম। পরিচিত-অপরিচিত রূপকথার দেশ, মানুষজন তার কল্পনায় ধরা পড়ে। আচরণের দিক থেকে ঠিক যেন খোকাটি থাকে না সে আর। বীরপুরুষের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ডাকাতদলের উপর। কাল্পনিক দুঃখে ব্যথিত হয় সে। অন্যদিকে 'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছবি'তে শিশু মেতে ওঠে তার প্রাণের স্হজ আনন্দে। এলোমেলো, অসংলগ্ন ছবি তাকে মোহিত করে। নির্মল হাসিতে মেতে ওঠে সে।

ছোটদের জন্য রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শিশু'[২]। ১৯০৩-০৪ সালে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের সপ্তম ভাগে 'শিশু' প্রকাশিত হয়। পরে স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থরূপে এটি ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'শিশু'র রচনাকালে সম্পর্কে জানিয়েছেন—

> *"বহু বৎসর পূর্বে (১৯০৩) কবি এখানে (আলমোড়ায়) তাঁহার রুগ্নাকন্যা রেণুকার বায়ু পরিবর্তনের জন্য আসিয়াছিলেন। সেই সময় এখানে বসিয়া লেখেন 'শিশু'র কবিতাগুচ্ছ।"*

অর্থাৎ 'শিশু'র কবিতাগুলি রচনার সময় কবি প্রত্যক্ষ করছেন তাঁর অসুস্থ কন্যাকে। একই সঙ্গে তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর (১৯০২) মাতৃহীন পুত্রকন্যাদের মানসিক বিষাদ নীরবে লক্ষ করেছেন তিনি। ফলে শিশুদের জন্য তাঁর সদ্যকৃত লেখাতে অন্তর্লীন বিষাদের স্রোত খেলে গেল। কবির বাল্যকালের অপ্রাপ্তিজনিত স্নেহবুভুক্ষার স্মৃতি এক্ষেত্রে সমান ক্রিয়াশীল ছিল বলে মনে হয়। একই সঙ্গে তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল শৈশব হারানো দিনগুলির বেদনাও। 'শিশু'র বিষাদের কারণ হতে পারে—

> *"... রবীন্দ্রনাথের শৈশব সাধনার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই অন্তর্লীন বিষাদ। এককালে সমস্ত পৃথিবী ছিলো অধিকারে; ধাতু ধুলো হওয়া পুতুল সব এককালে হুকুম শুনতো আমার এখন ক্রমেই যত বড়ো হয়ে গেলাম, সব ধীরে ধীরে হারিয়ে গেলো। স্বপ্নের মধ্যে ব্যথার চাপ যেমন, এই রচনাগুলির মধ্যে সেই রকমই এক বিচ্ছেদের বোধ গুঞ্জন ক'রে উঠেছে।"*[৩]

অর্থাৎ শৈশবহীনদের শৈশবের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই যেন 'শিশু' ও 'শিশুভোলানাথ' এর জন্ম।

প্রবণতা অনুযায়ী 'শিশু'র কবিতাগুলি দুই ধরণের। প্রথম শ্রেণির কবিতাতে কথকের ভূমিকা পালন করেছে শিশুটি নিজে। অর্থাৎ মাকে উদ্দেশ্য করে শিশুর জবানীতে কবিতাগুলি লিখিত হয়েছে। 'বীরপুরুষ', 'প্রশ্ন', 'লুকোচুরি', 'বৈজ্ঞানিক', 'মাস্টারবাবু', 'বিজ্ঞ', 'সমব্যথী' প্রভৃতি এই শ্রেণির কবিতা। 'শিশু'র দ্বিতীয় শ্রেণিতে আছে শিশুসম্বন্ধীয় কবিতা। শিশুমনের বহুবিচিত্রভাব ও শিশুচরিত্রের বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে এখানে। পাশাপাশি এই ধরণের কবিতায় সন্তানের স্নেহে আকুল মাতৃমনস্তত্ত্বের পরিচয় রয়েছে। 'শিশু'র প্রারম্ভিক 'জন্মকথা' কবিতায় তাই সন্তান হারানোর

সম্ভাব্য আশঙ্কায় শঙ্কাতুর মায়ের ছবি ফুটে উঠেছে—

"হারাই হারাই ভয় গো তাই।
বুকে চেপে রাখতে যে চাই,
কেঁদে মরি একটু সরে দাঁড়ালে।
জানিনা কোন্ মায়ায় ফেঁদে
বিশ্বের ধন রাখব বেঁধে
আমার এ ক্ষীণ বাহুদুটির আড়ালে।"

শিশুর লতিত শ্রী-তে মুগ্ধ মা বারবার সন্তানকে মুগ্ধ নয়নে দেখেন। শিশুর প্রতি মায়ের স্নেহময় হৃদয়ের ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে এখানে—'ভুবনখানি / গগন হতে উপাড়ি আনি / ভরিয়া দুটি ললিত মুঠি / দিব কি তুলিয়া / কী চাস ওরে, অমন করে / শরম ভুলিয়া।' 'শিশু'র কল্পনার জগতে মা-ও ভেসে যেতে পারেন অনায়াসে। 'খোকা' কবিতায় মা খোকার ঘুমের রাজ্যে পৌঁছে যায় খোকাকে অবলম্বন করেই—

"খোকার চোখে যে ঘুম আসে
সকল-তাপ-নাশা—
জান কি কেউ কোথা হতে যে
করে সে যাওয়া-আসা।
শুনেছি রূপকথার গাঁয়ে
জোনাকি-জ্বলা বনের ছায়ে
দুলিছে দুটি পারুল-কুঁড়ি,
তাহারি মাঝে বাসা
সেখান থেকে খোকার চোখে
করে সে আসা যাওয়া।"

মাতৃমনস্তত্বের উল্লেখ থাকলেও 'শিশু' কাব্যের প্রধান চরিত্র শিশু। মুলত তাকে কেন্দ্র করেই গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি কবিতা আবর্তিত হয়েছে। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ শিশুর জিজ্ঞাসা অসীম। এমনকি তার নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সে প্রশ্নাকুল। 'জন্মকথা' কবিতায়—

"খোকা মাকে শুধায় ডেকে,
'এলেম আমি কোথা থেকে,
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।"

সৃষ্টি রহস্যর জটিল তত্ত্ব খোকার উপলব্ধিতে ধরা সম্ভব নয়। তাই মা বলেন—'ইচ্ছে হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।' ঠিক খোকাটি না হয়ে সে যদি অন্য কেউ হতো, তবে কি হতো—এই প্রশ্নও তার

মনে দেখা দিয়েছে—

"যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম কুকুর-ছানা—
তবে পাছে তোমার পাতে
আমি মুখ দিতে যাই ভাতে
তুমি করতে আমায় মানা?
সত্যি করে বল
আমায় করিসনে মা ছল—
বলতে আমায় 'দূর দূর দূর।
বলতে থেকে এল এই কুকুর?
যা মা, তবে যা মা
আমায় কোলের থেকে নামা।"

'লুকোচুরি' কবিতাতেও শিশুর এই জিজ্ঞাসা ব্যক্ত হয়েছে।

শিশুর জগৎ বড়োদের জগতের থেকে পৃথক। অনেকক্ষেত্রেই শিশুর এই জগৎ তাঁর নিজেরই সৃষ্টি। শিশুর সৃজনবিশ্ব যে সবসময় বাস্তবের সঙ্গে সখ্যতা ও সম্পর্ক বজায় রাখবে— তেমনটা নয়। 'সে জগতে কারো কোন কাজে বাধাবন্ধ নেই সে মুক্তির জগৎ।'[৪] 'খোকার রাজ্য' কবিতায় তারই ইঙ্গিত—

"সেথা ফুল-গাছপালা
নাগকন্যা রাজবালা
মানুষ রাক্ষস পশু পাখি,
যাহা খুশি তাই করে,
সত্যেরে কিছু না ভরে,
সংশয়েরে দিয়ে যায় ফাঁকি।"

এই মনোরাজ্যে বড়োদের অধিকার থাকলেও, তারা ভুলে যায় ছোটদের কথা। বিশেষত লেখকেরা ছোটদের যে উপেক্ষার নজরে দেখে, তা শিশু ভালই বুঝতে পারে। 'সমালোচক' কবিতায় তাই বাবার অন্তরালে তামাম লেখককুল তার অভিযোগের পাত্র—

"বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে।
কিছুই বোঝা যায় না লেখেন কী যে।

.....

এমন লেখায় তবে

বল্ দেখি কী হবে।
তোর মুখে মা, যেমন কথা শুনি,
তেমন কেন লেখেন নাকো উনি।
ঠাকুরমা কি বাবাকে কক্‌খনো
রাজার কথা শোনায় নিকো কোনো।
সে-সব কথাগুলি
গেছেন বুঝি ভুলি?"

ছোটদের সৃজনবিশ্বে না পৌঁছাতে পারার বেদনাবোধ ও সংশয় রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে চুপিসাড়ে ছিল বলেই, 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের (১৯৩২) 'ছেলেটা'-তে বলেছেন—'কোনোদিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে / আর সেই নেড়ি কুকুরের ট্রাজেডি।'

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন ছোটদের অনুকরণ-প্রিয়তা। সে বড়োদের মতো নয়। তবু সে বড়োদের মতো হতে চায়। তাই সে হয়ে ওঠে বাবার মতো। 'ছোটবড়ো'তে—

"গুরুমশায় দাওয়ায় এলে পরে
চৌকী এনে দিতে বলব ঘরে,
তিনি যদি বলেন 'সেলেট কোথা?
দেরি হচ্ছে, বসে পড়া করো!'
আমি বলব, 'খোকা তো আর নেই,
হয়েছি যে বাবার মতো বড়ো'।"

বাবার মতো বড়ো হয়েছে বলেই সে আজ গুরুমশায়। 'মাষ্টারবাবু' হলেও সে নিষ্ঠুর নয়—

"আমি আজ কানাই মাস্টার,
পোড়োমোর বেড়ালছানাটি।
আমি ওকে মারি নে মা, বেত,
মিছিমিছি বসি নিয়ে কাঠি।"

এই 'গুরুমশায়' হওয়ার সুপ্ত বাসনা রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার স্মৃতি উস্কে দেয়।[৫]

'শিশু'র জনপ্রিয় কবিতা 'বীরপুরুষ' এই অনুকরণের ইচ্ছায় শিশুর বীরপুরুষ হয়ে ওঠার কাহিনি। শিশু গল্পশোনে বীর রাজপুত্রের। অসমসাহসী যোদ্ধা দেশ ও জাতির জন্য প্রাণপণ লড়াই করে সকলের প্রশংসা কুড়ায়। খোকাও মনে মনে সকলের প্রশংসার পাত্র হতে চায়। তাই সে ভাবে এমন কিছু করে দেখানোর কথা, যা তাকে বিখ্যাত করবে। ফলে সে তার সবথেকে প্রিয় মা-কে রক্ষা করতে চায় ডাকাত দলের হাত থেকে। দস্যু দলের বিরুদ্ধে তার লড়াই শিশুর কাছে

রোমহর্ষক উত্তেজনার বিষয়—

'হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল—
কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল।
আমি বলি, 'দাঁড়া খবরদার,
একপা কাছে আসিস যদি আর
এই চেয়ে দেখ্ আমার তলোয়ার,
টুকরো করে দেব তোদের সেরে।'
শুনে তারা লম্ফ দিয়ে উঠে
চেঁচিয়ে উঠল 'হাঁরে রে রে রে রে'।।
তুমি বললে, 'যাস নে খোকা ওরে।'
আমি বলি, 'দেখো-না চুপ করে।'
ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝন্‌ঝনিয়ে বাজে,
কী ভয়ানক লড়াই হলো মা, যে
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে,
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা।।'

শিশু মনস্তত্ত্বে এই বড়োদের মতো হয়ে ওঠার আকাঙ্খার দুর্নিবার আকর্ষণ সদা সক্রিয়। শিশু তাই তার মাকে চরম বিপদে অভয় (যেমনটি তার মা তাকে দিয়ে থাকে) দেয়—'আমি আছি, ভয় কেন, মা, করো।' অবশ্য কবি জানেন শিশুর এই জগৎ কল্পনার জগৎ। তাই কবিতার শেষে শিশুকে ফ্যাণ্টাসির জগৎ থেকে নামিয়ে এনেছেন মাটির পৃথিবীতে। শিশু নিজে তাই উপলব্ধি করে—

"রোজ কত কী ঘটে যাহা তাহা—
এমন কেন সত্যি হয় না আহা?
ঠিক যেন এক গল্প হত তবে,
শুনত যারা অবাক হত সবে—"

'শিশু' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত হয়ে 'নদী' কবিতাটি প্রথমে প্রকাশিত হয়। পরে স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হয় এটি। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী নদীর অলংকরণ করেন। ছোটদের চঞ্চল স্বভাবের সঙ্গে নদীর আশ্চর্য মিল লক্ষ করা যায়। 'নদী' কবিতাতেও শিশুর উচ্ছ্বাস ও চাপল্য প্রতিধ্বনিত হয়েছে। নদী প্রবাহিত হয় প্রাণের আনন্দে। তার গতি অপ্রতিহত। শিশুও এগিয়ে চলে আপন খেয়ালে । প্রাণের আনন্দই তার কাছে মুখ্য। প্রাণধর্মের সঙ্গে মিল থাকলেও রবীন্দ্রনাথের 'নদী' কবিতা ছোটদের জন্য সার্থক রচনা নয়। কেননা নদীর দীর্ঘ বর্ণনা ছোটদের মনোযোগ আকর্ষণের পক্ষে

দীর্ঘ। তাছাড়া 'নদী'র মধ্য দিয়ে মানবজীবনের প্রবহমানতার যে দার্শনিক উপলব্ধি কবি সঞ্জাত করে দিতে চান পাঠকের মধ্যে, তা ছোটদের পক্ষে অনুপযুক্ত।

জীবন-সায়াহ্নে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্য লিখলেন 'শিশু ভোলানাথ' (১৯২২)। প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ এতদিনপর পুনরায় ছোটদের জন্য কবিতা লিখতে বসলেন তাঁর অন্তরের তাগিদ থেকে। কেননা আমেরিকার যন্ত্রসভ্যতায় আহত ও বিপন্ন শৈশবকে প্রত্যক্ষ করে তিনি মানসিকভাবে বিচলিত হয়েছিলেন। পরিকল্পনা করলেন ছোটদের জন্য লেখার বিষয়। 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী'তে এ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন—

> *"আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই 'শিশু ভোলানাথ' লিখতে বসেছিলুম। বন্দী যেমন ফাঁক পেলেই ছুটে আসে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে, তেমনি করে। ... প্রবীনের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে—লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।"*

নাম কবিতায় সৃষ্টির বার্তাবহ চিরনবীন শিশুকে আহ্বান করে কবি মিশে যেতে চেয়েছেন তাঁদের দলে—

> *"ওরে শিশু ভোলানাথ, মোরে ভক্ত বলে*
> *নে রে তোর তাণ্ডবের দলে;*
> *দে রে চিত্তে মোর*
> *সকল-ভোলার ঐ ঘোর,*
> *খেলনা-ভাঙার খেলা দে আমারে বলি।"*

'শিশুভোলানাথ' এর ছোটদের বোধগম্য কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিতা হল 'তালগাছ', 'খেলাভোলা', 'রাজা ও রাণী', 'হারিয়ে যাওয়া', 'ঠাকুর দাদার ছুটি', 'মনে-পড়া', 'অন্য মা', ইত্যাদি। এই কবিতাগুলিও 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোর মতোই ছোটদের ছেলেমানুষিতে ভরপুর। 'হারিয়ে যাওয়া' কবিতায় ছোট মেয়েটি অন্ধকার রাতে ছাদে উঠতে গিয়ে ভয় পায়। দমকা হাওয়ায় তার প্রদীপ নিভে যাওয়ায় ছোটদের মতোই ভয়ে কেঁদে ওঠে সে—

> *'হঠাৎ মেয়ের কান্না শুনে, উঠে*
> *দেখতে গেলেম ছুটে।*
> *সিঁড়ির মধ্যে যেতে যেতে*
> *প্রদীপটা তার নিভে গেছে বাতাসেতে।*

শুধাই তারে, 'কী হয়েছে বামী?'
সে কেঁদে কয় নীচে থেকে, 'হারিয়ে গেছি আমি।'

চিরচেনা মায়ের সম্পর্কেও শিশুর মনোভাব বদলায় নি এখানে। মা যে তার সবচেয়ে প্রিয় আশ্রয়স্থল, তার সন্ধান মেলে 'অন্য মা' কবিতায়।

"আমার মা না হয়ে তুমি আর-কারো মা হলে—
ভাবছ তোমায় চিনতেম না, যেতেম না ওই কোলে?
মজা আরও হতো ভারি—
দুই জায়গায় থাকতো বাড়ি,
আমি থাকতেম এই গাঁয়েতে তুমি পারের গাঁয়ে।
এইখানেতেই দিনের বেলা
যা-কিছু সব হ'ত খেলা,
দিন ফুরোলেই তোমার কাছে পেরিয়ে যেতেম নায়ে।

মাতৃপ্রেমের পাশাপাশি শিশুর মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে উদার প্রকৃতির আহ্বান। বন্ধনমুক্ত জীবনের ডাকে উদ্বেল জীবন তাত্ত্বিকতামুক্ত হয়ে অপূর্ব সারল্যে উপস্থিত হয়েছে 'তালগাছ' কবিতায়—

"তালগাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে
সবগাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।
মনে সাধ কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়,
একেবারে উড়ে যায়—
কোথাপাবে পাখা সে।।
তাই তো সে ঠিক তার মাথাতে
গোল গোল পাতাতে
ইচ্ছেটি মেলে তার
মনে মনে ভাবে বুঝি ডানা এই
উড়ে যেতে মানা নেই
বাসাখানি ফেলে তার।।

রবীন্দ্রনাথ শিশুর শৈশবের ছবি আঁকলেও তাঁর শিশু তত্ত্ব ও দর্শনের রূপক হয়ে ওঠে। হিন্দু পুরাণ মতে ভোলানাথ শিব রুদ্রের দেবতা। রবীন্দ্রনাথের ভোলানাথও রুদ্রের প্রতিমূর্তি—

"ওরে মোর শিশু ভোলানাথ,
তুলি দুই হাত

যেখানে করিস পদাঘাত

বিষম তাণ্ডবে তোর লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় সব,

.....

আপনসৃষ্টিকে

ধ্বংস হতে ধ্বংস মাঝে মুক্তি দিস অনর্গল,

খেলারে করিস রক্ষা ছিন্ন করি খেলেনা-শৃঙ্খল।"

এই কাব্যগ্রন্থের মূল লক্ষ্য শিশু। তার বিচিত্র কর্মকাণ্ড, ভালো-মন্দ সমস্তদিক উঠে এসেছে এখানে। ভোলানাথের মতো সে আপন খেয়ালরাজ্যের অধিশ্বর। সাত সমুদ্র তেরোনদী পেরিয়ে পৌঁছে যায় পরীর দেশে, রূপকথার দেশে। তবুও 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথে'র অনেক কবিতাই শিশুর মানসরাজ্যে পৌঁছাতে পারে না। শিশুর তুলনায় তার পরিপার্শ্বের মানুষজনকেই তা তৃপ্তি দেয় বেশি। শব্দের অর্থগত মানে না বুঝতে পারলে শুধু ছন্দ ও ধ্বনি[৬] শিশুকে সবসময় আকৃষ্ট করতে পারে না। বয়স্ক পাঠক তার রস গ্রহণে সক্ষম হলেও শিশু অনুধাবন করতে পারে না তার মাধুর্য। ফলে 'শিশু' কিংবা 'শিশু ভোলানাথ-এর অনেক কবিতাকেই শিশুপাঠ্য বলে মনে হয় না। শিশুর গভীর অনুভব ব্যক্ত হলেও এই কবিতাগুলি শিশু সাহিত্য কিনা, সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকে। তাই 'শিশু' কিম্বা 'শিশু ভোলানাথ' পরিপূর্ণ শিশুপাঠ্য নয় এবং এই দুটি কাব্যগ্রন্থ ছোটদের জন্য রচিত হলেও তা যুগপৎ ছোট ও বড়োদের পাঠ্যতাগুণে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। অর্থাৎ এই দুই কাব্য গ্রন্থের কিছু কবিতা ছোটদের ভালোলাগার জগৎ ছুঁয়ে থাকে। অপর কবিতাগুলি বড়োদের মনে ছোটদের বিচিত্র কর্মকাণ্ডকে পৌঁছে দেয়।

(৩)

জীবনের প্রান্তবেলায় রবীন্দ্রনাথ মনোযোগী হয়েছিলেন ছবি আঁকায়। সাদা-কালো আঁচড়ে, রঙে রেখায় ফুটে ওঠা তাঁর ছবিগুলি চেনা-অচেনার মধ্যবর্তী জগৎকে তুলে ধরেছে। সমকালে রচিত রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও এই ছবির প্রভাব লক্ষণীয়। এমনকী রবীন্দ্রসান্নিধ্যে বিকশিত অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামী শিল্পী ও ভাস্করদের রচনাও কবিকে বিচলিত করেছে; প্রাণিত করেছে নতুন সৃষ্টি কর্মে। ফলে এই পর্বে জীবনের শেষ দশ বছরে রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যেও রূপান্তরের বাঁক এল। ছড়া এবং গল্প, এই দুই বিভাগেই রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় নিলেন আলো ও ছায়ার মধ্যবর্তী জগতে। রবীন্দ্রনাথের খাপছাড়া জগৎ এই সময় উপহার দিল 'খাপছাড়া' (১৯৩৭), 'ছড়ার-ছবি' (১৯৩৭), 'ছড়া' (১৯৪১)। এগুলি ছড়া ও কবিতার সংকলন। একই সঙ্গে এসময় তিনি লিখলেন 'সে' (১৯৩৭) 'গল্পস্বল্প' (১৯৪১) নামে দুটি গদ্য ও পদ্য সংকলন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'ছড়ার ছবি'র (১৯৩৭) উৎস প্রসঙ্গে জানালেন—

"আলমোড়া আসিবার সময় নন্দলাল বসু-অঙ্কিত কতকগুলি স্কেচ্ কবি সঙ্গে

করিয়া আনিয়াছিলেন, সেগুলিকে কেন্দ্র করিয়া 'ছড়ার-ছবি' একটির পর একটি লিখিয়া যান। ... সাধারণ লোকের দৃষ্টি যাহাদের উপর পড়ে না, সেই অভাজনের দল জীবন্ত, অর্থপূর্ণ হইয়া উঠে শিল্পীর তুলির লিখনে। শিল্পীর রূপসৃষ্টিকে কবি আজি শব্দের প্রতীকদ্বারা ছন্দের সাহায্যে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতেছেন।"

ছড়া রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আকর্ষণের বিষয়। মূলত তাঁর উৎসাহ ও উদ্যোগে বাংলা লৌকিক প্রচলিত ছড়াগুলি সংকলনের কাজ শুরু হয়েছে। সেইসূত্রে তিনি গ্রাম্য ছড়াগুলির সঙ্গে সম্যক ভাবে পরিচিত ছিলেন। জানতেন শিশুচিত্তে ছড়ার আবেদন তুঙ্গস্পর্শী। পরবর্তীকালে যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও সুকুমার রায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কসূত্রে তিনি পরিশীলিত ছড়ার সম্ভবনাময় রূপটি প্রত্যক্ষ করেছেন। এই দুজনের হাতে বাংলা ছড়া যে বিপুল সমৃদ্ধিলাভ করেছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সপ্রশংস দর্শক। কাছ থেকে দেখার ফলে ছড়ার প্রতি তাঁর আগ্রহ ও আকর্ষণ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল ছড়া রচনায়। জীবনের শেষভাগে পৌঁছে তিনি তাই লিখতে শুরু করলেন ছোটদের জন্য ছড়া। 'খাপছাড়া'র ভূমিকায় জানালেন কাজটি বেশ কঠিন। কেননা—

"সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে,
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।
.....
কঠিন লেখা নয়কো কঠিন মোটে,
যা-তা লেখা তেমন সহজ নয় তো।"

এই 'যা-তা লেখা' লিখতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় নিলেন খাপছাড়ার জগতে। খাপছাড়া অর্থাৎ যা চলেনা চেনা-জানা পথে। আজগুবি বা ননসেন্স-এর উদ্ভট, মায়াবী জগতে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে গেলেন ক্ষুদে পাঠকদের।

শিল্পের প্রয়োজনে লেখক মাঝে মাঝে খাপছাড়া উদ্ভট এমন সব শব্দ লেখার মধ্যে ব্যবহার করেন, আপাতভাবে যার কোনো অর্থ থাকে না। প্রয়োগবৈশুণ্যে সেই শব্দগুলি হাসির উদ্রেক করে। আপাত অর্থহীন শব্দের ব্যবহারে মজার মজার মুহূর্ত উপহার দিয়ে এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে 'ননসেন্স লিটারেচার'। শুধুমাত্র উদ্ভট শব্দ নয়, বিষয় ও বিন্যাসগত অদ্ভুতুড়ে পরিবেশ সৃষ্টিকরেও 'ননসেন্স সাহিত্য' বা খাপছাড়া 'আবোল তাবোল' সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব। সুকুমার রায় 'আবোল তাবোল' এর কবিতাগুলি 'ব্যাকরণ মানি না' বলে ননসেন্স সাহিত্যেকে সমৃদ্ধির সুউচ্চ শিখরে স্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথও পৌঢ় বয়সে তাঁর এই অনুজের অত্যাশ্চর্য জগতে আশ্রয় নিলেন। এর সঙ্গে যুক্ত হল রবীন্দ্রোচিত 'উইট' ও 'হিউমার'। ব্যঙ্গ বা শ্লেষ এবং নির্মল হাস্যরসের সংমিশ্রণে তিনি 'ননসেন্স' বা খাপছাড়ার জগতে যোগীন্দ্রনাথ ও সুকুমারের বিজয়রথ এগিয়ে নিয়ে গেলেন।

মধ্য বয়সে রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যে লঘু চাপল্যের স্থান ছিল না। 'খাপছাড়া'র ছড়াগুলিতে কবি ভেসে চলেছেন বিশুদ্ধ ছেলেমানুষীর জগতে। লিখলেন—

''ক্ষান্তবুড়ির দিদি শাশুড়ির
পাঁচবোন থাকে কালনায়—
হাঁড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়,
শাড়িগুলো রাখে আলনায়।
কোনো দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে
নিজে থাকে তারা লোহাসিন্দুকে,
টাকাকড়িগুলো হাওয়া খাবে ব'লে
রেখে দেয় খোলা জালনায়—
নুন দিয়ে তারা ছাঁচিপান সাজে,
চুন দেয় তারা ডালনায়।''

সুকুমার রায়ের 'বোম্বাগড়ের রাজা' কিংবা লীয়রের "The courtship of the youngly Bonghy Bo" ইতিপূর্বে পড়া থাকলেও ছোটরা এই সর্বনাশা তিন বুড়ির কাণ্ডকারখানায় মুগ্ধ না হয়ে প'রে না। কিংবা সেই বে-আক্কেলে জামাইটি; ২৪ নং কবিতায় তার ঠাট্টা ছোটদের অনাবিল কৌতুক উপহার দেয়—

''বর এসেছে বীরের ছাঁদে,
বিয়ের লগ্ন আটটা—
পিতল-আঁটা লাঠি কাঁধে,
গালেতে গাল পাট্টা।
শ্যালীর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে
আলাপ যখন উঠল জমে,
রায়বেঁশে নাচ নাচের ঝোঁকে
মাথায় মারলে গাঁট্টা।
শ্বশুর কাঁদে মেয়ের শোকে,
বর হেসে কয়—'ঠাট্টা' ''

অসংগতিপূর্ণ ও অসম্ভব ঘটনা আমাদের মনে শান্ত উদার হাস্যরসের সৃষ্টি করে। ব্যঙ্গ কিংবা শ্লেষ অনেক সময় অন্যকে উপলক্ষ করে অস্ত্রের মতো ব্যবহার করেন লেখক। কিন্তু নির্মল হাস্যরস মানুষকে আহত করে না। মানুষের চারিত্রিক অসংগতিও জন্ম দেয় এইরকম নির্মল হাস্যরসের। নির্লজ্জ, নির্মম, লোভী, ঔদারিক, ভীরু, শঠ, মিথ্যেবাদী, অলস, আত্মমর্যাদাজ্ঞানহীন, চালবাজ, চরিত্র শিশু আসরে কৌতুকের সৃষ্টি করেছে।[৭]

খাওয়ার প্রসঙ্গে ছোটরা হামলে পড়ে। খাবারের সঙ্গে তাদের বিশেষ সখ্যতা। খাবারের ফিরিস্তি শুনতেও তারা ভালোবাসে। ২ নং কবিতায় পেটুক দামোদর শেঠের খাবারের তালিকা ছোটদের জিভেও জল আনে—

"অম্লেতে খুশি হবে
দামোদর শেঠ কি?
মুড়কির মোয়া চাই
চাই ভাজা ভেটকি।"

এরপর কথা প্রসঙ্গে এসেছে মটকি ভরা ঘি, জলপাইগুঁড়ির জিওল কই, চাঁদনির বোয়াল, চিনে বাজারের করমচা, কাঁকড়ার ডিম, গরম চা, ঝড়িয়ার জিলিপির কথা। অবশ্য বেশি খেলে তার পরিণাম যে খুব একটা ভালো হয় না, তার পরিচয়ও আছে 'খাপছাড়া'তে—

"রসগোল্লার লোভে পাঁচকড়ি মিত্তির
দিল ঠোঙা শেষ করে বড়ো ভাই পৃথ্বীর।
সইল না কিছুতেই, যকৃতের নিচুতেই
যন্ত্র বিগড়ে গিয়ে ব্যামো হল পিত্তির।"

খাপছাড়ার মতো নির্ভেজাল কৌতুকরস মুখ্য নয় 'ছড়ার ছবিতে'। দৈনন্দিন জীবনের টুকরো টুকরো ছবি এখানে পরিলক্ষিত হয়। 'ছড়ার ছবি' জীবনের খণ্ডচিত্র। কেননা, এই গ্রন্থের কবিতাগুলির অনুপ্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন নন্দলাল বসুর আঁকা কতগুলি স্কেচ থেকে। এখানকার সব কবিতাই যে ছোটদের মতো নয়, তা কবি জানতেন বলেই 'ছড়ার ছবি'র ভূমিকায় জানিয়েছেন—

"এই ছড়াগুলি ছেলেদের জন্যে লেখা। সবগুলো মাথায় এক নয়; রোলার চালিয়ে প্রত্যেকটি সমান সুগম করা হয় নি। এরমধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদি কোনোটা থাকে তবে তার অর্থ হবে কিছু দুরূহ, তবু তার ধ্বনিতে থাকবে সুর। ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে।"

শুধুমাত্র ধ্বনির উপর নির্ভর করতে হয় নি যে সমস্ত কবিতাতে, সেখানে ছোটরা অনায়াসে প্রবেশ করতে পারে। উপলব্ধি করতে পারে তার রূপ-রস-গন্ধ। সেখানে সে প্রত্যক্ষ করে আশ্চর্য শিশু জগৎ। 'ভজহরি' কবিতায় এমনই এক আশ্চর্য জগৎ রয়েছে—

"কেউ বা ওরা দাঁড়ের পাখি, পিঁজরেতে কেউ থাকে,
নেমতন্ন চিঠিগুলো পাঠিয়ে দেব ডাকে।
মোটা মোটা ফড়িং দেব, ছাতুর সঙ্গে দই,

ছোলা আনব ভিজিয়ে জলে, ছড়িয়ে দেব খই।
এমনি হবে ধূম,
সাত পাড়াতে চক্ষে কারও রইবে না আর ঘুম।
ময়নাগুলোর খুলবে গলা, খাইয়ে দেবো লঙ্কা;
কাকাতুয়া চীৎকারে তার বাজিয়ে দেবে ডঙ্কা।
পায়রা যত ফুলিয়ে গলা লাগাবে বক্‌বকম;
শালিকগুলোর চড়া মেজাজ, আওয়াজ নানারকম।"

শিশুদের চেনাপরিচিত দৃশ্য ও শব্দের অভাব নেই 'ছড়ার ছবি'তে। কবি এই গ্রন্থের সূচনায় যে 'ধ্বনি' নিয়ে খেলা করার কথা বলেছেন তার বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ করা যায় 'ছড়া' গ্রন্থের সংকলিত লেখাগুলিতে।

(৪)

ছোটদের জন্য লেখা রবীন্দ্রনাথের গদ্যসম্ভার গ্রন্থিত হয়েছে 'লিপিকা' (১৯২২), 'সে' (১৯৩৭) এবং 'গল্পসল্প' (১৯৪১) গ্রন্থে। শেষোক্ত গ্রন্থদুটি ছোটদের জন্য লেখা হলেও 'লিপিকা' প্রথমাবধি ছোটদের জন্য লেখা নয়। 'সবুজপত্র' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার সময় থেকেই 'লিপিকা'র আঙ্গিক সম্পর্কে মতান্তর দেখা দিয়েছে। 'গদ্য কবিতা', 'ছোটগল্প' কিংবা 'কথিকা' যাই হোকনা কেন, 'লিপিকা'র বেশ কিছু রচনা ছোটদের মনোজগতে দিব্যি প্রবেশ করতে পারে। জীবনের উপান্তে পৌঁছে নাতনী পুপে এবং কুসমীর কাছে রবীন্দ্রনাথ 'সে' এবং 'গল্পসল্প'র লাগামহীন ঘোড়াটিকে ছুটিয়েছেন ইচ্ছেমেঘের দেশে। 'লিপিকা'র বালকপাঠ্য গল্পগুলিতে করুণা, ঐহিত্যবোধ, শাশ্বত মানবধর্ম, শিশুমনস্তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত হয়েছে পাঠকের সামনে। 'সে' ও 'গল্পসল্প'তে লেখক খেয়াল খুশির জগতে পৌঁছে গেছেন। আপাতভাবে ভিত্তিহীন আজগুবি মনে হলেও সমকালীন রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিবেশে সন্ত্রস্ত্র মানবতার বিপন্নতায় ব্যথীত রবীন্দ্রনাথের প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপ লক্ষ করা যায় এই দুটি বইতে। 'গল্পসল্প'তে কথক দাদুটির আশেপাশে তাদেরই ভিড় জমলো, সাংসারিক সুবুদ্ধি যাদের পাগল বলে। যা কিছু আইনমানা, আপোসে চলা, নিক্তিমাপা, মধ্যবিত্ত, নামহীন, সেই 'সে' যেন তারই মূর্তিমান প্রতিবাদ।'[৮]

'লিপিকা'র গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথের প্রখর সমাজদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। শিশু চরিত্রের আধারে শাশ্বত মানবতাবোধের বিপন্নতার ছবি ফুটে উঠেছে 'বিদূষক', 'ঘোড়া', 'তোতাকাহিনী' গল্পে। প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ রূপকথার অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন 'লিপিকা'র বিভিন্ন রচনায়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য— 'ভুলস্বর্গ', 'রাজপুত্তুর', 'সুয়োরানীর সাধ', 'বিদূষক', 'তোতাকাহিনি', 'পট', 'রথযাত্রা', 'পরীর পরিচয়', 'মুক্তি' প্রভৃতি। কিছু রচনায় সরল শিশুমনস্তত্ত্ব ধরা পড়েছে। 'সত্তগাত', 'প্রশ্ন', 'গল্প' এই ধরণের রচনা।

বিজয়গর্বী রাজতন্ত্রের নির্মমতার রূপটি ধরা পড়েছে 'বিদূষক' গল্পে। কাঞ্চীর রাজা কর্ণাট জয় করে ফেরার পথে ছেলের দলকে যুদ্ধযুদ্ধ খেলতে দেখলেন। ছেলেরা রাজাকে জানাল যে তাদের নকলযুদ্ধে কাঞ্চীর রাজার পরাজয় এবং কর্ণাটরাজের জয় হয়েছে। ক্রুদ্ধ অপমানিত কাঞ্চীরাজ সেই ছেলের দলকে উপযুক্ত শাস্তি দিলেন বেত লাগিয়ে। রাজার সন্ত্রাসে রাজ্যশুদ্ধ লোক স্তব্ধ হয়ে গেলো। এই ঘটনায় রাজার বিদূষক তাঁর কাজ থেকে বিদায় নিতে ছুটি চাইলেন। গল্পের রূপকের মধ্য দিয়ে লেখক রাষ্ট্রীক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নিরুচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ছেলের দল প্রতিবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। রাজা তার রাজধর্ম ভুলে গেলে যে সত্য ও সুন্দরের অপমৃত্যু ঘটে, তার উল্লেখ ঘটেছে বিদূষকের হাসতে ভুলে যাওয়ার ঘটনায়।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের শানিত ব্যঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে 'তোতাকাহিনি' গল্পে। শিক্ষাতন্ত্রের নির্মম জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে তোতাপাখীর মতো শৈশবেরও যে অপমৃত্যু ঘটে, লেখক তির্যক দৃষ্টিভঙ্গিতে সে কথাই তুলে ধরেছেন 'তোতাকাহিনি'তে। আনিন্দ্যনীয় সোনার খাঁচা তৈরী করে বনের পাখিকে বন্দী করে শিক্ষিত করে তোলার প্রাণান্তকর চেষ্টা চলে এই গল্পে। তার দানাপানি বন্ধ হয়। শেষে মৃত পাখিটিকে রাজা দেখতে এসে— 'রাজা পাখিটাকে টিপিলেন, সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খসখস গজগজ করিতে লাগিল।' পুঁথি নির্ভর বিকল শিক্ষা-ব্যবস্থার ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কণ করে রবীন্দ্রনাথ শৈশবহীন বাঙালি ছেলে-মেয়েদের দুর্দশার ছবি তুলে ধরেছেন এই গল্পে।

রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ রূপকথার গল্প লেখেননি। কিন্তু রূপকথা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তাঁর লেখায়। 'লিপিকা'র কয়েকটি গল্পেও রূপকথার অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে। 'সুয়োরাণীর সাধ' গল্পে সুয়োরাণী ও দুয়োরাণীর প্রসঙ্গই প্রধান। সুয়োরাণী দুয়োরাণীর সমস্ত ঐশ্বর্য কেড়ে নিয়েছেন। তবু তার মনে বড় সাধ দুয়োরাণীর ঐ সামান্য সুখটুকুও মনেপ্রাণে উপলব্ধি করার। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় সে। আত্মগ্লানিতে ভুগে মনোঃকষ্টে পীড়িত হয় সে। 'পরীর গল্পে' রাজপুত্র বনবাসিনী ক'লো মেয়েটিকে দেখে আপ্লুত হয়। অবশ্য রাজপুত্র সংক্রান্ত মিথ তিনি ভেঙে দেন স্বচ্ছন্দে। ছোটদের কাছে যে স্বপ্নের নায়ক, সে এসে দাঁড়িয়েছে বাস্তবের কঠিন মাটিতে। 'রাজপুত্তুর' গল্পে আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ করি—

> *"রাজপুত্তুরের এ কী বেশ। এ কী চাল। গায়ে বোতামখোলা জামা, ধুতিটা খুব সাফ নয়, জুতো জোড়া জীর্ণ। পাঁড়াগায়ের ছেলে, শহরে পড়ে, টিউশানি ক'রে বাসাখরচ চালায়।"*

সেই রাজপুত্র দৈত্যের হাত থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে আনলেও তাকে বাস্তব পৃথিবীর জেলে

বন্দি জীবন কাটাতে হয়। কেননা 'ইতিহাসের মধ্যে তার বিচিত্র চেহারা, ইতিহাসের পরপারে তার একইরূপ, সে রাজপুত্তুর'। গল্পের শেষে রবীন্দ্রনাথ ছোটদেরকেই এই রাজপুত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছেন।

শিশুমনস্তত্ত্ব সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা ছিল। তাঁর লেখায় বারবার ছোটদের সরল চিত্তের সন্ধান পাওয়া গেছে। 'সওগাত' গল্পে মায়ের আদর তাই শিশুর কাছে শ্রেষ্ঠ সওগাত বলে মনে হয়েছে। মা শিশুর কাছে সব থেকে নিকটজন। মাতৃহারা সন্তানের হৃদয়-বেদনা ফুটে উঠেছে 'প্রশ্ন' গল্পে। মাকে বিসর্জন দিয়ে শ্মশান থেকে ফিরে আসার পর বাবাকে শিশু সবল প্রশ্ন করে 'মা কোথায়'। বাবা বলেছে 'স্বর্গে'। রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে শিশু তার মাকেই খুঁজেছে। কবিতার মতো গল্পেও এইভাবে মাতৃহারা শিশুর যন্ত্রণাকে ধরতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

'গল্পসল্প'র 'ম্যাজিশিয়ান' গল্পে রবীন্দ্রনাথ, 'সে' ও 'গল্পসল্প'র মুখবন্ধ রচনা করার জন্যই যেন বলেছেন—

> *"দেখো, অনেকদিন ধরে আমি গম্ভীর পোশাকি সাজ পরে এতদিন কাটিয়েছি, সেলাম পেয়েছি অনেক। এখন তোমাদের দরবারে এসে ছেলেমানুষির ঢিলে কাপড় পরে হাঁপ ছেড়েছি। সময় নষ্ট করার কথা বলছ, দিদি-একসময় তার হুকুম ছিল না। তখন ছিলুম সময়ের গোলাম। আজ আমি গোলামিতে ইস্তফা দিয়েছি। শেষের কটা দিন আরামে কাটবে। ছেলেমানুষির দোসর পেয়ে লম্বা কেদারায় পা ছড়িয়ে বসেছি। যা খুশি বলে যাব, মাথা চুলকে কারো কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না।"*

'সে' এবং 'গল্পসল্প' রচনার পাশাপাশি এইসময় রবীন্দ্রনাথ যে 'খাপছাড়া' নামে ছড়ার সংকলনটি প্রকাশ করেছেন, সেখানেও এই 'যাখুশি' কথা বন্ধনমুক্ত স্রোতের মতো খেয়ালখুশির জগতে ভেসে গেছে। 'যা-কিছু সৃষ্টি ছাড়া, উদ্ভট, বেয়াড়া, মাত্রতিরিক্ত, তারাই দলে-দলে ভিড় করে এল এখানে।' এই সৃষ্টিছাড়া জগতের কথকতা শুনিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর দুই নাতনীকে। প্রতিমাদেবীর পালিতা কন্যা 'পুপোদিদি'কে 'সে'র গল্পগুলি এবং 'গল্পসল্প'র গল্পগুলি শুনিয়েছেন কুসুমীকে।

ছোটদের কাছে গল্পবলার কৌশল আয়ত্ব করার অনুশীলন যেন 'সে'-র মূল উদ্দেশ্য। 'সে'-র মূল চরিত্র তিনটি। কথক রবীন্দ্রনাথ, নাতনী এবং গল্পের নায়ক 'সে'। দাদু ও নাতনীর কথোপকথনের ঢঙে লেখা হুঁ হাই দ্বীপের ইতিহাস, গেছোবাবা, লেজকাটা শিয়ালের গল্প ছোটদের কল্পনার রাজ্যে নিয়ে যায়। গল্পের পরিপূরক রূপে এই গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নিজের

আঁকা ছবি। এই ছবির বিকল্পরূপে 'গল্পসল্প'তে রবীন্দ্রনাথ সংযোজন করেছেন ছড়া। 'সে'র গল্পগুলির কোনো শিরোনাম না থাকলেও 'গল্পসল্প'র গল্পগুলির আলাদা নাম আছে। আলাদা আলাদা হলেও আন্তরিক সাযুজ্য লক্ষ করা যায় তাদের। বাধা-বন্ধনহীন জীবনের খোঁজে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, পৌনঃপুণিক জীবনাচরণের প্রতি প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপ লক্ষ করা যায় এই গল্পগুলিতে।

ছোটদের জন্য লেখা বইগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনাতেও শিশুসাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের কৌতুকনাট্যগুলি ছোটদের জন্যই রচিত। রবীন্দ্রনাথের এই নাটকগুলি হেঁয়ালি নাট্যরূপে পরিকল্পনা করেছিলেন। 'ছাত্রের পরীক্ষা', 'পেটে ও পিঠে', 'রোগের চিকিৎসা', 'অন্ত্যেষ্টিসৎকার' নাটকগুলি ছোটদের আকর্ষণ করে। 'সহজপাঠ' (১৯৩০) শিশুশিক্ষার জন্য রচিত হলেও ছোটদের জন্য নির্মল আনন্দের আয়োজন রয়েছে সেখানে। 'গল্পগুচ্ছ'র 'পোষ্টমাষ্টার', 'কাবুলিওয়ালা', 'অতিথি' গল্পগুলিতেও ছোটদের প্রবেশের অধিকার অবাধ। রবীন্দ্রনাথের রচনা যেহেতু সবসময়ই বুদ্ধি প্রধান, তাই ছোটদের জন্য রচিত হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছোটরা রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে সংযোগস্থাপন করতে পারে না। তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্র কাব্য, নাটক, গল্পে বন্দি-শৈশবের বন্ধন মুক্তির আহ্বান শোনা যায়। রবীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্য এই মুক্তি পিয়াসী শিশুবিশ্বের কথা বলে বলেই, তা এক ও অদ্বিতীয়।

উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫)

(১)

বিজ্ঞানের নীরস জগৎ থেকে যাত্রা শুরু করে যে মানুষটি পশুপাখির জগতে অনায়াসে পৌঁছে যেতে পারেন, যিনি মুদ্রণযন্ত্রের ক্লান্তিকর শব্দকে মুহূর্তে মিশিয়ে দিতে পারেন বেহলার মূর্ছনায়, যাঁর প্রতিষ্ঠিত একটি পত্রিকা আমূল বদলে দিতে পারে বাংলা শিশু সাহিত্যের মানচিত্র—তিনি এক এবং অদ্বিতীয় উপেন্দ্রকিশোর। পিতৃদত্ত কামদারঞ্জন নাম যখন রূপান্তরিত হয়ে উপেন্দ্রকিশোর হল, তখনই কেউ কি ভেবেছিলেন, এই বালকটি পরবর্তীকালে শিশু কিশোরের হৃদয়ের মণি হয়ে উঠবেন? ময়মনসিংহের মসুয়াগ্রামের উপেন্দ্রকিশোর বাস্তবিকই পরবর্তী বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রতিভাবান স্রষ্টা রূপে ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন।

উপেন্দ্রকিশোরের জন্ম ২৮শে বৈশাখ, ১২৭০ বঙ্গাব্দে (ইং ১২মে, ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ) তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত) কিশোরগঞ্জ মহাকুমার অন্তর্গত মসুয়া গ্রামে। চারশো বছর আগে এই কায়স্থ পরিবারের (দেব) বাস ছিল নদিয়া জেলার চাকদহ গ্রামে। পরিবারের এক উদ্যমী যুবক রামসুন্দর ভাগ্যান্বেষণে ময়মনসিংহে উপস্থিত হন। মূলত তাঁরই প্রচেষ্টায় রায় পরিবার মসুয়ায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই বংশেরই অধস্তন পুরুষ ছিলেন কালীনাথ রায়। তাঁরই মধ্যমপুত্র কামদারঞ্জন। কালীনাথের জ্ঞাতি ভাই হরিকিশোর আইন ব্যবসায়ে প্রভূত

অর্থ উপার্জন করে জমিদারী কিনে 'রায় চৌধুরী' উপাধি গ্রহণ করেন। নিঃসন্তান হরিকিশোর কালীনাথের পুত্র কামদারঞ্জনকে দত্তক নিলেন। ১৮৬৮ সালে দত্তক গ্রহণের অনুষ্ঠানে কামদারঞ্জনের নতুন নাম হয় উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। উপেন্দ্রকিশোর বাংলার শিশু ও কিশোর সাহিত্যের স্বর্ণখনি কোলকাতার গড়পারের রায় পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা।

স্কুলের পাঠ শেষ করে তিনি কলকাতায় পড়তে আসেন। ছাত্রাবস্থায় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় আকর্ষণ ছিল। বি.এ. পাস করার পর তিনি কলকাতায় ৫০ নং সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে ভাড়া বাড়িতে উঠে আসেন। এই বাড়িটি ব্রাহ্মসমাজের আখড়া ছিল বলে একে 'ব্রাহ্মকেল্লা' বলা হত। এই ব্রাহ্মকেল্লা তাঁর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এখানেই প্রমদাচরণ সেনের প্রভাবে তিনি শিশুসাহিত্য রচনায় আকৃষ্ট হন। পরবর্তীকালে তিনি মুদ্রণ ব্যবসাতে যুক্ত হওয়ার পর সরাসরি সাহিত্য সাধনায় নিয়োজিত হলেন। উন্মোচিত হয় তাঁর শিশুসাহিত্যের মুক্তবেণী।

ছোটদের লেখকরূপে উপেন্দ্রকিশোরের আত্মপ্রকাশ ঘটে প্রমদাচরণ সেন সম্পাদিত মাসিক 'সখা' পত্রিকায়। ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত 'সখা'র দ্বিতীয় সংখ্যায় সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত উপেন্দ্রকিশোরের 'মাছি' লেখাটি ছাপা হয়। এরপর ভুবনমোহন রায় সম্পাদিত 'সাথী', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মুকুল' পত্রিকায় তিনি নিয়মিত ছোটদের জন্য লেখালেখি চালিয়ে যান। কিন্তু অন্তরে অন্তরে প্রয়োজন অনুভব করেন এমন এক শিশু ও কিশোরপাঠ্য পত্রিকার যা শিশুদের মনের সামগ্রী হতে পারবে। ফলে ১৯১৩ সালে (১৩২০ বঙ্গাব্দ) তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'সন্দেশ'। 'সন্দেশ' সেকালে ছিল সব দিক থেকে অনন্য। এর পূর্বে যে সব শিশু ও কিশোর পাঠ্য পত্রিকা বেরিয়েছে, তার কোনোটিই এই পত্রিকার ধারে কাছে আসে না। এর ছাপা, ছবি, অঙ্গ-সজ্জা ও বিভিন্ন লেখার এমন আকর্ষণ ছিল যে, পত্রিকাটি হাতে আসামাত্র পাঠক খুসিতে উচ্ছল হয়ে উঠতো। 'সন্দেশ' কে কেন্দ্র করেই উপেন্দ্রকিশোরের পরবর্তী সাহিত্যজীবন আবর্তিত হয়েছে। ছোটদের জন্য উপেন্দ্রকিশোর লিখেছেন— ছেলেদের রামায়ণ (১৩০৪),ছোট্ট রামায়ণ (১৯১১), সেকালের কথা (১৯০৩), পুরাণের গল্প, ছেলেদের মহাভারত (১৯০৮), গুপিগাইন বাঘা বাইন (১৯৬৩),মহাভারতের গল্প (১৯০৯) , বিবিধ প্রবন্ধ, টুনটুনির বই (১৯১০), ও 'গল্পমালা' ।

ছোটদের মনের মতো বই লেখার কাজে তিনি সদা সচেষ্ট ছিলেন। তাই বিজ্ঞানের ছাত্র না হয়েও তিনি প্রথম দিকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলি ছোটদের মতো করে উপস্থিত করেছেন। 'বিবিধ প্রবন্ধে' সেই সমস্ত রচনা সংকলিত হয়েছে। শুধু বিজ্ঞান বিষয়ে সচেতন করার জন্যই তিনি ছোটদের হাতে কলমে কাজ শেখার কাজে প্রাণিত করেছেন। বাতাসের অম্লজানের পরীক্ষা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন — "এইগুলি তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। কেবল আমরা বলিতেছি বলিয়া ভালোমানুষের মতো মানিয়া লইবার প্রয়োজন নাই।" বিজ্ঞান মনস্ক করার পাশাপাশি শিশুদের সুকুমার প্রবৃত্তি ও সুকোমল মনকে সজীব রাখার উদ্দেশ্যে তিনি এমন এক অদ্ভুত জগৎ তৈরি করেন, যা নীতি গল্পের জগৎ। রামায়ণ - মহাভারতের উচ্চ আদর্শের জগৎ। অথচ শিশু মনের উপর তত্ত্বের

জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দিলেন না। বরং তাঁর রচনায় এমন এক কোমল কৌতুকময় আবহ তিনি ছড়িয়ে দিলেন, যা তাঁকে ছোটদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে স্থাপন করেছে।

(২)

উপেন্দ্রকিশোরের সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ তাঁর 'টুনটুনির বই' (১৯১০)। 'টুনটুনির বই' সম্ভবত তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। মোট ছাব্বিশটি গল্প এখানে স্থান পেয়েছে। অধিকাংশ গল্পই নীতি গল্পের মতো মনুষ্যেতর প্রাণীদের সজীব ক্রিয়াকর্মে মুখর। পাখিদের মধ্যে টুনটুনি তো আছেই, আর আছে কাক চড়াই। পশুর মধ্যে আছে ছাগল, শেয়াল, বেড়াল, হাতি। বাঘ আছে সব চেয়ে বেশি। দশটি গল্পের সে নায়ক। শেয়ালের আধিপত্য আছে ৮টি গল্পে। এমনকি পিঁপড়ে, কুমিরও আছে। গল্পে এই যে পশু-পাখিদের আধিপত্য, তার প্রেরণা তিনি পেয়েছেন উইলিয়াম কেরির 'ইতিহাসমালা' (১৮১২) এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (১৮৩৩) গ্রন্থ থেকে। উপেন্দ্র কিশোর এই উৎস থেকে ঋণগ্রহণ করে, তাকেই শিশুদের মতো করে পুনর্নির্মাণ করেছেন। পূর্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে ভাষার যে জড়তা ও গাম্ভীর্য তা উপেন্দ্রকিশোরে গল্পগলিতে সরল, পেলব ও মসৃন হয়েছে।

প্রথম গল্পে আমরা দেখি, বিড়ালনীর লোভ থেকে বাচ্চাদের বাঁচাতে গিয়ে ও দুষ্ট বেড়ালকে সাজা দিতে গিয়ে বেগুন গাছের কাঁটা ফুটেছিল টুনটুনির গায়ে। তা থেকে হল ফোঁড়া, যার নিরাময়ের উপায় অস্ত্রোপচার। এ কাজে ওস্তাদ নাপিত তাকে ফিরিয়ে দেয়—রাজাকে যে কামায় সে কিনা ঐটুকু ফোঁড়া কাটবে? সম্মানে লাগবে না? টুনটুনি এই অপমানের শোধ নেয়। নাপিত শুধু নয়, রাজা, ইঁদুর, বিড়াল, লাঠি, আগুন, সাগর, হাতি সবারই এক কথা - 'থাকো খাও শোও, কিন্তু তোমার ওকাজে আমরা নেই'। সকলের উপর রেগে টং হয় টুনটুনি। শেষকালে রাজি হল এক মশা। তার বুদ্ধিতে জব্দ হলো সবাই—

হাতি বলে সাগর শুষি
সাগর বলে আগুন নেবাই
আগুন বলে লাঠি পোড়াই
লাঠি বলে বিড়াল ঠেঙাই
বিড়াল বলে ইঁদুর ধরি
ইঁদুর বলে রাজার দাড়ি কাটি
রাজা বলে নাপতে বেটার মাথা কাটি

শেষ পর্যন্ত রাজার ভয়ে নাপিত টুনটুনিকে কাঁটামুক্ত করে নিস্তার পায়।

টুনটুনির দ্বিতীয় অভিযানে সে জব্দ করে 'নচ্ছার পাঁজী রাজাকে'। টুনটুনি রাজাকে নিয়ে ছড়া কাটলে ('রাজা ভারি ভয় পেল / টুনির টাকা ফিরিয়ে দিল'।) রাজার মোসাহেবরা এই কথা অতিরঞ্জিত করে রাজার কানে তোলে। রাজা রেগে টং। তার আদেশে টুনটুনিকে ধরে আনা হল

আর রাজা তার রাণীদের আদেশ দেন টুনটুনি পাখিটিকে ভেজে দিতে। তিনি তাকে খাবেন। রাণীরা সেই সুন্দর পাখিটাকে দেখতে গেলে হাত ফসকে পাখি পালাল। ভয়ে একটা আস্ত ব্যাঙ ধরে রাণীরা রাজাকে ভেজে খেতে দিল। রাজা মহাখুশি। যেই রাজা ব্যাঙটি খেলেন, অমনি টুনটুনি ছড়া কেটে বলে—

'বড় মজা বড় মজা,।
রাজা খেলেন ব্যাঙ ভাজা।'

রাগে-দুঃখে রাজা সাত রাণীর নাক কেটে ফেলার আদেশ দিলেন। শেষমেশ টুনটুনিকে গিলতে গিয়ে রাজার নাক কাটা গেল নিজের সিপাইয়ের তরোয়ালেই। তারপর রাজামশাই তো ভয়ানক চ্যাঁচালেন, সঙ্গে সঙ্গে সভার সকল লোক চ্যাঁচাতে লাগল। তখন ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে 'পটি বেঁধে অনেক কষ্টে রাজামশাইকে বাঁচাল।'

পরের গল্পটি একটি ছাগলকে নিয়ে। ছাগলটি শেয়ালের গর্তে লুকিয়ে ঘোষণা করে যে সে সিংহের মামা নরহরি দাস। তার লম্বা দাড়ির বহর দেখে প্রথমে শেয়াল, পরে বাঘ ভড়কে যায়। দুজনে ভয়ে পালায় কিন্তু বাঘের লেজে বাঁধা শেয়াল আছাড় খেতে খেতে গুরুতর আহত হয়। পরের গল্প বাঘমামাকে শেয়াল নিজের নৌকা বাড়ি দেখাবার ছলে কুমিরের খপ্পরে ফেলে দেয়।

পরের গল্পে শেয়ালের সঙ্গে পরিচয় হয় এক জোলার। জোলাটির মতো আহম্মক খুব কম দেখা যায়। সেই জোলার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দিয়ে এবং শেষ অবধি তাকে রাজা বানিয়ে তবে ছাড়ল। জোলার বিয়েতে বরযাত্রীরা ছিল — শিয়াল ৫ হাজার , ব্যাঙ ১২ হাজার, শালিক ৭ হাজার, হাঁড়িচাচা ২ হাজার, ঘুঘু ৪ হাজার, চিক্কো ৩ হাজার, উৎক্রোশ ২ হাজার।

'টুনটুনির বই'য়ে শেয়ালদের খুব প্রাধান্য রয়েছে। বাঘ মামার সঙ্গে তার চির শত্রুতা। অথচ উপরে উপরে খুবই মিল। বাঘকে জব্দ করার নানা ফন্দি ফিকির বার করে সে। দুষ্টু বাঘের হাত থেকে সাদাসিধে ঠাকুরমশাইকে বাঁচায় শিয়াল তার বুদ্ধির জোরে। কখনও বা সে রাজবাড়িতে সাক্ষী হয়ে চোর ধরে দিয়ে সওদাগরকে বাঁচায়। মরা হাতির পেট থেকে বুদ্ধি করে বেরিয়ে এসেও শিয়াল তার বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। এই রকম নানা বুদ্ধির কসরৎ ছড়িয়ে আছে টুনটুনির বইয়ের প্রতিটি গল্পে।

বুড়িদের নিয়ে গল্পে আছে বুদ্ধির প্রাধান্য। শেয়াল বাঘ ভালুক মিলে ঠিক করে, তারা এক বুড়িকে খাবে। বুড়ি সবাইকে বলল যে সে খেয়ে দেয়ে নাতির বাড়ি থেকে এলে মোটা হয়ে যাবে। তারা অনেক মাংস পাবে। বুড়ি নাতনীর বাড়িতে মনের সুখে দিন কাটালো। তারপর নাতনির বুদ্ধিমতো বড়ো একটা লাউয়ের খোলে সেঁধিয়ে গেল বুড়ি। বাঘ-ভালুক দেখে যে একটা লাউ গড়িয়ে যাচ্ছে। একে একে সবাই ওকে গড়িয়ে দেয়। শেষে খোলমুক্ত বুড়িকে বাঁচিয়ে দেয়

বুড়ির কুকুর। 'পান্তা বুড়ি'র গল্পে এক চোর এসে বুড়ির পান্তা খেয়ে যেত। সেই চোরকে ধরার জন্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ সমস্ত জিনিস বুড়ির সাহায্যে এগিয়ে এল। পান্তা খেতে এসে চোর ঠিক ধরা পড়ে গেল। ক্ষুর, বেল, শিঙি মাছ, গোবর বুড়িকে সাহায্য করল। ধনী রাজা থেকে নিঃস্ব বুড়ি, কীটপতঙ্গ , এমন কি গাছেরা, নদীরাও নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে উপেন্দ্রকিশোরের গল্পে। এসেছে বাংলার রূপকথা লোককথার প্রসঙ্গ। 'টুনটুনির বই' এর পাশাপাশি তাঁর 'গল্পমালা' র গল্পগুলিও অসাধারণ। এখানে সংকলিত গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল — 'সহজে কি বড়লোক হওয়া যায়,' 'বানর রাজপুত্র' 'ঘ্যাঁঘাসুর' 'সাতমার পালোয়ান', 'মজন্তালি সরকার' ইত্যাদি।

'মজন্তালি সরকার' গল্পটিতে একটি 'গুলবাজ' বিড়ালের মধ্য দিয়ে সমাজের আত্মরম্ভী মানুষদের পরিণতি দেখানো হযেছে। ছেলেদের বাড়ি ঠেঙানি খাওয়া হাড় জিরজিরে এক বেড়াল বুদ্ধি করে গোয়ালাদের বেড়ালকে সরিয়ে নিজে গোয়ালার বেড়াল হয়ে বসল। গোয়ালার বাড়ি ভালো-মন্দ খেয়ে দু-দিনে ফুলে ঢোল হয়ে গেল। মজন্তালী সরকার নাম নিয়ে রাজার বাজার সরকার সেজে বনের পশুদের ওপর ছড়ি ঘোরানোর জন্য নানান গল্প ফাঁদলো। শেষে এই বানিয়ে বলার জন্য বেঘোরে তার প্রাণটা গেলো। বিরাট জন্তু আর গণ্ডার শিকার করতে গিয়ে সজারুর ভয়েই সে চিৎপাত হয়েছে। আর হাতির পায়ের তলায় চিপটে গিয়েছে। বনের জন্তুরা যখন এই দৃশ্য দেখে হায় হায় করতে লেগেছে, তখন মজন্তালী বলে—'আর কী হবে? তোরা যে সব ছোট-ছোট জানোয়ার পাঠিয়েছিলি! দেখে হাসতে হাসতে আমার পেটই ফেটে গিয়েছে।'

'সাতমার পালোয়ান' গল্পে কানাই রামকুঁড়ে। তার মুখরা স্ত্রী তাকে মাটির কাঁচা হাঁড়ি কলসী পাহারা দিতে বলল। মাটির পাত্রের উপর মাছি বসলে সে এক চড়ে সাতটি মাছিকে মেরে ফেলে। তারপরে দেমাকে তার মাটিতে পা পড়ে না। মাথায় বড় ফেট্টি জড়িয়ে সে রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে পালোয়ানের চকরি নেয়। পরে দুষ্ট লোকের প্ররোচণায় বাঘ মারতে গিয়ে (পালাতে গিয়ে) সে দৈবাৎ কব্জা করে ফেলে রাজ্যেরভীতু বাঘটিকে। এরপর তারই বিক্রমে দেশের রাজা যুদ্ধে জয়লাভ করলে দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে সাতমারী পালোয়ানের নাম। 'ঘ্যাঘাসুর' গল্পে যদু নামে একটি গরীব অথচ সাহসী ছেলে ঘ্যাঘাসুরের প্রাসাদ থেকে ঘ্যাঘাসুরের সোনার পালক এনে লাভ করে রাজকন্যাকে। 'লাল সুতো নীল সুতো' গল্পে এক জোলার বোকামির অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা রয়েছে। জোলার গল্পের সঙ্গে কালিদাসের কাহিনির মিল লক্ষ করা যায়।

তবে এসব গল্প নয়, পরবর্তীকালে উপেন্দ্রকিশোরের সবার্ধিক জনপ্রিয় হওয়া (সত্যজিতের সিনেমার কল্যাণে) গল্প 'গুপি গাইন, বাঘা বাইন'। 'গুপি' আর 'বাঘা' - দুজনেরই ইচ্ছে মস্তবড় সংগীত শিল্পী হওয়ার। কিন্তু —

> *"যখন সে ঘরে বসে গাইত, তখন তার বাবার দোকানের খদ্দের সব ছুটে পালাত।*
> *যখন সে মাঠে গিয়ে গান গাইত, তখন মাঠের যত গরু সব দড়ি ছিঁড়ে ভাগত। ...*
> *পাঁচুর ছেলেটির বড্ড ঢোলক বাজাবার শখ ছিল। বাজাতে বাজাতে সে বিষম ঢুলতে*

থাকত, আর পা নাড়ত আর চোখ পাকাত, আর দাঁত খিঁচোত আর ভ্রুকুটি করত। তার গ্রামের লোকেরা তা দেখে হাঁ করে থাকত আর বলত, 'আহা! আ-া-া!! অ-অ-হ্-হ্-হ্!!!' শেষে যখন 'হাঃ, হাঃ হা-হা!' বলে বাঘের মত খেঁকিয়ে উঠত, তখন সকলে পালাবার ফাঁক না পেয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে যেত।"

এই সাংঘাতিক সংগীতে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন সকলে মিলে তাদের গ্রামছাড়া করে। বাঁশগাছের জঙ্গলের মধ্যে দুইমানিক জোড়ের সাক্ষাৎ। ভূতের তিনবর প্রাপ্তি। এবং শেষ পর্যন্ত সেই ইচ্ছাপূরণের বরে তারা শুণ্ডীর রাজার জামাই হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করলো। বাকি জীবন 'আনন্দে সংগীত চর্চা' করে কাটাল।

'গুপি গাইন বাঘা বাইনের' গল্পে উপেন্দ্রকিশোর পারিবারিক ঐতিহ্য ও স্নেহের বন্ধনের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই রাজার দরবারে চাকরি পাওয়ার পরও তাদের অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যে গ্রাম থেকে,সেখানেই তারা বাবা মাকে দেখতে যেতে চেয়েছে। তারা বলেছে —" মহারাজ দয়া করে আমাদের দুদিনের ছুটি দিতে আজ্ঞা হোক, আমরা আমাদের পিতা - মাতাকে দেখে তাঁদের অনুমতি নিয়ে আপনার রাজ বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হব।" মা-বাবার প্রতি এই কর্তব্যবোধ বাঙালি শিশুদের কাছে পারিবারিক আদর্শবোধ প্রতিষ্ঠার আন্তরিক প্রয়াস বলে মনে হয়।

(৩)

ছোটদের সামনে উচ্চ-নৈতিক আদর্শ স্থাপনের জন্যই উপেন্দ্রকিশোর রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ করেছেন - একথা যেমন ঠিক, তেমনি ছোটদের ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করানোর মহান দায়িত্বও তিনি অন্তরে অনুভব করেছিলেন। তাই একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েও তিনি ভারতীয় পুরাণের গল্প লিখেছেন। ছোটদের মতো করে লেখা সেসব কাহিনি উপভোগ্য ও মনোরম। সহজ সরল ভাষায় লেখা তাঁর গদ্য পাঠককে আকৃষ্ট করে।

'ছেলেদের রামায়ণ' (১৩০৪) দিয়ে উপেন্দ্রকিশোরের গ্রন্থ রচনা শুরু। তিনি রামায়ণ কাহিনির মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ছোটদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সরস বর্ণনার মাধ্যমে তিনি রামায়ণের মায়ানগরীর দ্বার উদঘাটন করেছেন শিশুদের সামনে। তুলে ধরেছেন প্রাচীন অযোধ্যাকে —

"সেকালের অযোধ্যা নগর আটচল্লিশ ক্রোশ লম্বা, আর বার ক্রোশ চওড়া ছিল। তাহার চারিদিকে প্রকাণ্ড দেওয়ালের উপরে লোহার কাঁটা দেওয়া ভয়ঙ্কর অস্ত্রসকল সাজানো থাকিত। সে অস্ত্রের নাম শতঘ্নী, কেননা, তাহা ছুঁড়িয়া মারিলে একেবারে শতশত লোক মারা পড়ে।"

এই অযোধ্যার রাজকুমার রাম এবং তাঁর পরিবারের বিভিন্ন ঘটনা-উপঘটনার প্রাঞ্জল বর্ণনায় ছোটদের রামায়ণ স্মরণীয় হয়ে আছে।

পরে উপেন্দ্রকিশোর অরো একবার লিখেছিলেন রামায়ণ কাহিনি তবে তা ছিল পদ্যে লেখা। সেই 'ছোট্ট রামায়ণ' ছন্দের আনন্দে ছোটদের ভরিয়ে রেখেছিল। রামের ক্ষৌরকর্মের বিবরণ দিয়ে লিখেছেন—

পুরোনো নাপিত যারা ক্ষুরে শান দিয়া তারা
সাজিয়া আইল তাড়াতাড়ি,
রামের যতেক জট চেঁছে দিল চটপট —
যতনে কামায়ে দিল দাড়ি।

উপেন্দ্রকিশোর রামায়ণ কাহিনির পাশাপাশি ছোটদের জন্য লিখেছিলেন ছেলেদের 'মহাভারত'। সেখানেও তিনি আশ্চর্য সুন্দর সব বর্ণনা দিয়েছেন—

"অর্জুন কী অশ্চর্য খেলাই দেখাইলেন। একবার অগ্নিবাণে ভীষণ আগুন জ্বালাইয়া তিনি সকলের ত্রাস লাগাইয়া দিলেন। তাহার পরেই আবার বরুণ বাণে জলের বন্যা বহাইয়া আগুন নিবাইয়া ফেলিলেন; এখন সকলে তল না হইল বাঁচে। তখনই আবার বায়ুবাণ ছুটিল; অমনি জল উড়িয়া গিয়া সব পরিষ্কার ঝরঝরে। "

উপেন্দ্রকিশোরের মহাভারতে বেদব্যাসের কাহিনির গাম্ভীর্য উধাও হয়েছে। বরং পরিবর্তে বাংলার গ্রাম জীবন, মানুষজন সেখানে আশ্চর্যভাবে খাপ খেয়ে গেছে। বর্ণনার চমৎকারিত্বে প্রতিটি চরিত্র জীবন্ত হয়ে ওঠে। ছোটরা গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসে হস্তিনাপুরের রাজসভায় পৌঁছে যায়। আর কি আশ্চর্য উপেন্দ্রকিশোরের রাক্ষসও বাঙালি গৃহবধূর মতো 'পাঠাইবোনি' বলে কথা বলে—

কী বিকট চেহারা। এক কান হইতে আর এক কান পর্যন্ত তাহার দাঁত।
..... সে গর্জন করিয়া বলিল, মোর ভাতটি খাইছিস? তোকে যম-ঘর পেঠ্ঠাইবো নি? ..... রাক্ষস দুই হাতে ধাঁই ধাঁই করিয়া প্রাণপণে তাঁহার পিঠে কিল মারিতে লাগিল।

মহাভারতের মূল কাহিনির পাশাপাশি অসংখ্য উপকাহিনির মালা গেঁথেছেন তিনি। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য - সৃষ্টির কথা, মনুর কথা, দুষ্মন্ত শকুন্তলার কথা, অগস্ত্যের কথা, নল-দময়ন্তীর কথা ইত্যাদি। শৈশবের দিনগুলিতে ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের অমৃত স্বাদ এনে দিয়েছে এই রামায়ণ ও মহাভারত।

ভারতীয় পুরাণগুলি থেকে মণিমুক্তা আহরণ করে তিনি 'গল্পে পুরাণ' গ্রন্থটি রচনা করেছেন। এই গ্রন্থের একটি ছাড়া বাকি গল্পগুলি সাধু ভাষায় লেখা। ফলে গল্পে প্রাচীনত্বের আবহ সৃষ্টি হয়েছে। তবে গল্প বলার ভঙ্গিটি ভারি মনোরম। গল্পের মাঝখানে উপেন্দ্রকিশোর ছোটদের পৌরাণিক, শব্দ, রাজার নাম, নামের ব্যাখ্যা অতিসহজে বলে চলেন। ছোটরা সহজেই শিখেনেয় সেসব—

> *"সকলের আগে যাহাকে রাজা বলিয়াছিল, তাঁহার নাম পৃথু .... 'রাজা' কিনা, যে রঞ্জন করে অর্থাৎ খুশি রাখে। পৃথু নানারকমে প্রজাদিগকে খুশি করিয়াছিলেন, তাই সকলে মিলিয়া তাঁহাকে 'রাজা' নাম দিয়াছিল..."*

উপেন্দ্রকিশোরের দুটি গল্পের নায়ক গণেশ। কৈলাস পর্বতে যখন শিব পার্বতীর ছেলে গণেশ একবার পার্বতীর আদেশে ঘরের দরজায় পাহারা দিতে বসলেন। পার্বতী তাকে বললেন, যাতে কেউ ঘরে না ঢোকে। শিব তাঁর ভূতপ্রেত নিয়ে এসে হাজির হলেন সেখানে। গণেশ কাউকেই চেনে না, সে কাউকেই ঢুকতে দিলো না। শিবের মাথায় 'ধাঁই করিয়া' লাঠি বসিয়ে দিল গণেশ। ভূতেরা, এসে চেঁচামেচি করলেও গণেশ ভয় পেলো না, বললো — 'বাঃ। মুখের ছিরি দেখ। যা বেটারা এখান থেকে।' শিব পর্যন্ত 'আশ্চর্য' হলেন। মহাযুদ্ধ বেধে গেল। সেই যুদ্ধেই গণেশের মাথা পড়ল কাটা। তখন পার্বতী বললেন গণেশকে বাঁচাও। কিন্তু গণেশের মাথাটা পাওয়া গেল না কোথাও। বাধ্য হয়ে একটা হাতির মাথা গণেশের শরীরে জুড়ে দেওয়া হল। পার্বতী বললেন তাঁর ছেলেকে দেবতা বলে কেউ মানবে না। মহাদেব বললেন যে,গণেশই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। 'সেই অবধি সকল দেবতার আগে গণেশের পূজা হয়।'

'হনুমানের বাল্যকাল' গল্পে বালক হনুমানের দৌরত্ম বেশ মজার পরিবেশ তৈরি করে। 'রেবতীর বিবাহ' গল্পে রেবতীর বিয়ে হয়েছে কৃষ্ণের অগ্রজ বলরামের সঙ্গে। তবে এই বিবাহে একটু মুশকিল হয়েছিল, কেননা—'বলরাম হইতেছেন দ্বাপর যুগের লোক, তিনি সাত হাত লম্বা, রেবতী ত্রেতা যুগের মেয়ে, তিনি চৌদ্দ হাত লম্বা, বলরাম প্রাণপণে হাত বাড়াইয়াও তাঁহার মাথার নাগাল পান না। তখন বলরাম করিলেন কি, তাঁহার লাঙলের আগা দিয়া রেবতীকে চাপিয়া অন্যান্য মেয়েদের মতো বেঁটে করিয়া লইলেন। বেঁটে মানে সাত হাত কিন্তু। আমাদের মতো নয়।'

উপেন্দ্রকিশোরের গল্পের বিন্যাস জটিলতামুক্ত। সারল্যের প্রাসাদগুণ তাঁর গল্পের অলিন্দে অলিন্দে উপস্থিত। গুপী ও বাঘার সংগীত সাধনায় গ্রামের লোকের বাধা দেওয়া, তারপর জঙ্গলে তাদের দেখা হওয়া, সেখান থেকে তাদের দুজনে মিলে রাজাকে গান শোনাতে যাওয়ার চেষ্টা — এসবের মধ্যে একধরনের গ্রাম্য সরলতা আছে। কিংবা বোকা হলেও অসম্ভব সারল্য নিয়ে জোলা উপস্থিত হয় 'লালসুতো নীল সুতো গল্পে'। 'টুনটুনির বই' কিংবা 'গল্পমালা'র গল্পগুলি এই সরাল্যের গুণেই পাঠককুলের চিত্ত হরণ করেছে।

(৪)

উপেন্দ্রকিশোরের ভাষা ছিল ঝরঝরে, পরিচিত এবং উপভোগ্য। ছোটরা যেমন করে ভাবে বা বলে, দেখে এবং শোনে, উপেন্দ্রকিশোর ঠিক সেইভাবে তাদের লিখেছেন। বড়োরাও এসব গল্প পড়ে খুশি হন। উপেন্দ্রকিশোরের জীবজগৎ কথা বলে মানুষের ভাষাতেই।

'টুনটুনির বই' থেকে উদাহরণ নেওয়া যাক, "টুনটুনি গেছিল বেগুন পাতায় বসে নাচতে। নাচতে - নাচতে খেল বেগুন কাঁটার খোঁচা। তাই থেকে তার হল মস্ত বড় ফোড়া। 'ওমা, কী হবে? এত বড় ফোড়া কী করে সারবে?' টুনি একে জিগগেস করে, তাকে জিগগেস করে। সবাই বলে, 'ওটা নাপিতকে দিয়ে কাটিয়ে ফেল।"

উপেন্দ্রকিশোর তার গদ্যে চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। তার পছন্দ ছিল কথ্য ভাষায় গল্প বলা। 'ঘ্যাঁঘাসুর' গল্পে তাই এমন অসুরের বর্ণনা শুনি, রূপকথার জগতে যার কোনো অস্তিত্বই নেই, বরং সুকুমার রায়ের অনাগত জগতে যাকে আমরা স্পষ্ট করে দেখেছি — "খানিকটা পাখি, খানিকটা জানোয়ার, বিদ্‌ঘুটে চেহারা, খিটখিটে মেজাজ, ভারি জ্ঞানী, বেজায় ধনী, অসুর ঘ্যাঁঘা মহাশয়।" 'গুপিগাইন বাঘা বাইন' গল্পে ভূতেদের সংলাপও এই চলিত রীতি অনুসারী। গুপী বাঘার সংগীতে প্রীত হয়ে ভূতের রাজা বলেন — 'থামলি কেন বাপ? বাজা, বাজা, বাজা' অথবা "চল্ বাবা মোদের গোদার বেটার বেতে। তোদের খুশি করে দিব।" বাঁকুড়া সন্নিহিত অঞ্চলের লোকেরাতো এভাষাতেই কথা বলে।

ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করে ভাষায় গতি এনেদেন তিনি। কখনও কখনও বুদ্ধির মার প্যাঁচে কাহিনির ভাষাকে অবশ্যম্ভাবী উপকরণ রূপে ব্যবহার করেন তিনি। যেমন 'লালসুতো নীলসুতো' গল্পে গরীব জোলার পরিচয় দিতে গিয়ে যে ধাঁধার উল্লেখ করা হয় তার মর্মউদ্ধার করা রীতিমত কসরতের ব্যাপার —

'দেখতে রাজা বড়ই ভালো,
ঘরময় তার চাঁদের আলো,
বুদ্ধি তার আছে যেমন,
লেখাপড়া জানে তেমন,
এক ঘায়ে তার দশটা পড়ে,
তার গুণে লোক খায় পরে।'

এর প্রকৃত অর্থ — জোলার ঘরের চাল ফুটো বলে চাঁদের আলো ভিতরে ঢুকত। 'বুদ্ধি তার আছে যেমন, লেখাপড়া জানে তেমন' —অর্থাৎ বুদ্ধি জোলার ছিলই না, লেখাপড়াও তার ঠিক তেমন। এক ঘায়ে তার দশটা পড়ে অর্থাৎ দশটা ধানের শিষ। সে কাপড়ও বুনত। শেষ লাইনটিও মিথ্যে নয়।

প্রয়োজনে লোকজ উপাদান ব্যবহার করেছেন তিনি। তাঁর 'টুনটুনির বই' কি বা 'গল্পমালা'র সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এই লোকজ উপাদান। লোক গল্পে যেমন পশুপাখি মানুষের সহবস্থানে সকলেই সমান গুরুত্বে আসীন। শিয়াল, মানুষ, কুমীর বর-কনে, নাপিত, কুমোর, ঢুলি - সবাই এক সমাজেরই অঙ্গ। কীটপতঙ্গও এরাজ্যে রাজার চেয়ে শক্তিমান হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। পৃথিবীটা যে শুধু মানুষের একার নয়, সেই ধারণা সভ্যতার গোড়া থেকেই বোধবুদ্ধিযুক্ত মানুষের মনে বদ্ধমূল। আজকের নতুন সভ্যতা শুধু নতুন করে শিখতে বসেছে, ভাবতে বসেছে এই সরল সত্যটুকু। ক্রম অপসৃয়মান সমাজে এখানেই উপেন্দ্রকিশোর ও তাঁর শিশুসাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতা।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার ঃ (১৮৬৬-১৯৩৭)

(১)

"Bangalees born in this century, who have not learnt their alphabat from the profousely illustratied "Hashikushi' must be very few. The rythems in the book cast magic spelt over the children."

('The Statesman' পত্রিকা)

শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা অসংখ্য। এদের মধ্যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে চারটি বই। ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের দুখণ্ড 'বর্ণ পরিচয়' (১৮৫৫) অক্ষয় কুমার দত্তের 'চারুপাঠ' (তিন খণ্ড, ১৮৫৩, ১৮৬৪, ১৮৫৯), যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুশি' (১ম ভাগ ১৮৯৭) এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সহজপাঠ' (১৯৩৫)। শিশুদের জন্য লেখা হলেও একমাত্র যোগীন্দ্রনাথ ব্যতীত বাকি প্রত্যেকেই শিশুসাহিত্যের (অক্ষয় কুমার স্ত্রী শিক্ষার জন্য লিখেছিলেন) বাইরের জগতের। বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ শিশুসাহিত্যে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেও এঁদের মধ্যে যোগীন্দ্রনাথই ছিলেন শিশুসাহিত্যে নিবেদিত প্রাণ। ফলস্বরূপ তাঁর 'হাসিখুশি' সরস এবং শিশু পাঠকের হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। সহজ সরল ভাষায় তিনি শিশুদের মতো করে বলেছেন বলেই তাঁর 'হাসিখুশি' পাঠককে সম্মোহিত (Cast magic spell over the children) করে রাখে। শুধুমাত্র 'হাসিখুশি' বা অন্যান্য শিশুপাঠ্য গ্রন্থের রচয়িতা রূপেই নয়, যোগীন্দ্রনাথ তার সামগ্রিক সাহিত্য কর্মে এই সারল্য এবং শিশু মনস্কতার চিহ্ন বহন করেছেন।

ঠাকুর বাড়ি কিংবা রায় পরিবারের মতোই এক ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সন্তান যোগীন্দ্রনাথ। যশোরের দেব' পরিবারে ১৮৬৬ সালে (১২ই কার্তিক, ১২৭৩ বঙ্গাব্দ) যোগীন্দ্রনাথের জন্ম। জন্ম স্থান মাতুলালয় চব্বিশ পরগণার জয়নগরে। পিতা নন্দলাল দেব সরকার কর্মসূত্রে হাজারিবাগের বাসিন্দা, মাতা থাকমনি দেবী। (তাঁদের যশোরের পরিবার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রাজা নবকৃষ্ণদেবের মতো ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট) যোগীন্দ্রনাথের পূর্বনাম ছিল কেদারনাথ। ডাকনাম 'যোগী'র বহুল

প্রচলনের ফলে কেদারনাথ হলেন যোগীন্দ্রনাথ।

হাজারিবাগ জেলা থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি পড়াশুনার জন্য কলকাতায় এলেন। এখানেই ১৮৮৬ তে তার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ভিখারিচরণ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কবিতা কণিকা' পত্রিকাতে। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সুবাদে তাঁর সাথে পরিচয় হয় 'ব্রাহ্মকেল্লা'র (৫০ নং সীতারাম ষ্ট্রীটের ব্রাহ্ম যুবকদের ভাড়াবাড়ি) বিখ্যাত প্রমদাচরণ সেনের সঙ্গে। প্রমদাচরণের সম্পাদিত 'সখা' পত্রিকায় ছোটদের জন্য নিয়মিত লেখালিখি শুরু করেন। পরে নিজেই 'সিটি বুক সোসাইটি' নামে একটি প্রকাশন সংস্থা শুরু করেন। শুরু হয় তাঁর অনলস সাহিত্য চর্চা।

যোগীন্দ্রনাথের সংকলিত ও মৌলিক ছড়া এবং গল্পের সংখ্যা প্রায় তিরিশ। এছাড়াও দেশ বিদেশের সাহিত্যের থেকে মণিমুক্তা আহরণ করে লিখেছেন আরও অসংখ্য বই। তাঁর লেখা অনেক বই আজও দুষ্প্রাপ্য। প্রকাশক এবং আত্মবিস্মৃত পাঠককুলের আগোচরে এখনও রয়েছে অনেক বই। সব মিলিয়ে তার গ্রন্থ সংখ্যার ঊনআশি। যোগীন্দ্রনাথের প্রকাশিত বইগুলি হল :

অন্ধমুনি (১৩৩৫), অভিমন্যু (১৩৩৪), আদর্শপাঠ (১৯২৫, ২য়-১৯২৫), আদর্শ কবিতা (১৯০২) , আষাঢ়ে স্বপ্ন অথবা জানোয়ারের মেলা (১৯০০), উশীনর (১৯২৫), একলব্য (১৯৪০), কুরুক্ষেত্র বা কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ (১৯০৯), খুকুমনির ছড়া (১৮৯৯), খেলার গান (১২৯৮), খেলার সাথী (১২৯৮), গল্প সঞ্চয় (সম্পাদিত, ১৯৩৬), গান্ধারী, গুরুভক্তি (১৯১৭), নল-দময়ন্তী (১৯১৭), নূতন ছবি (১৯০৩), নূতন পাঠ (১৯২২), পঞ্চরত্ন (১৯২৪), পশুপক্ষী (১৯১১),প্রহ্লাদ (১৯২৬) , প্রাণীপরিচয় (১৯১১), বনে জঙ্গলে (১৯২৯), বন্দেমাতরম (১৯০৫), ব্যাস মহিমা, বিদ্যাসাগর জীবনী (১৯০৮), ভীষ্ম, মজার গল্প (১৯০৬), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (১৯১৫), মোহনলাল (উপন্যাস, ১৯৫০), রত্নাকর (১৯২৫), রাঙা ছবি (১৮৯৬)-সহলেখকদের সংকলন, হাসিরাশি (১৮৯৯), চারুপাঠ (১৯১৭), ছড়া ও ছবি আগমনী (১৯৩৭), সহ লেখকদের সংকলন ছড়া ও পড়া (১৯২১) , ছবি ও গল্প (১৮৯২), ছবির বই (১৯০১), ছেলেদের কবিতা (১৯২২), ছোটদের উপকথা (সম্পাদিত, ১৯৩৭), ছোটদের চিড়িয়াখানা (১৯২৯), ছোটদের মহাভারত (১৯১৯), ছোটদের রামায়ণ (১৯২৭), জানোয়ারের কাণ্ড (সহ লেখকদের সংকলন),জ্ঞানমুকুল (১৮৯০-১৮৯২), জ্ঞান প্রবেশ (১৯২৯), দৈত্য ও দানব (১৯২০), দ্রৌপদী (১৯২৭), ধ্রুব (১৯১৫), শকুন্তলা (১৯১০), শিক্ষা প্রবেশ (১৯২৯), শিক্ষা সঞ্চয় (১৯৩০), শিশুচয়নিকা (১৯৬৪), শিশুসাথী (১৯২০), শ্রীবৎস (১৯১০), সাথী (১৯১৬), সাবিত্রী সত্যবান (১৯১০), সাহিত্য (১৯১৯), সাহিত্য সঞ্চয় (১৯২৯) , সীতা (১৯২৫), সুশিক্ষা (১৯২৬), হরিশচন্দ্র , হাসি ও খেলা, হাসি খুশি (১৮৯৭), হাসির গল্প (১৯২০), হিজিবিজি (১৯১৬)।

মৌলিক গ্রন্থ ছাড়াও এই তালিকার অধিকাংশ বই শিশুশিক্ষার প্রয়োজনে লেখা। আশা গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন — 'প্রথম দিকে যোগীন্দ্রনাথ তৎকালীন প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী বিদ্যালয়

পাঠ্যতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা করেন।'[৯] এই বইগুলিই স্কুলপাঠ্যরূপে বিবেচিত হয়। যোগীন্দ্রনাথ ১৯২৩ থেকে ১৯৩০ এর মধ্যেই তাঁর অধিকাংশ স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯২৩ সালের ২৪শে ডিসেম্বর যোগীন্দ্রনাথ আংশিক পক্ষাঘাতগ্রস্থ হন। পরে বা'হাতে লেখা শিখে তিনি পৌরাণিক গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন।

সামগ্রিকভাবে যোগীন্দ্রনাথের মধ্যে দু'ধরণের প্রবণতা দেখা যায়। প্রথমত, তিনি নির্মল আনন্দ পরিবেশনের দিকে মনোযোগী ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ কবিতায় এই আনন্দবাদের প্রকাশ। দ্বিতীয়ত, তিনি এক উচ্চনৈতিক জীবনবোধে প্রাণিত ছিলেন। তাই ছোটদের নৈতিক জগৎ বলিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে তিনি নীতিমূলক আখ্যান রচনায় প্রয়াসী হন। পুরাণ-রামায়ণ-মহাভরতের অনুবাদ তাঁর এই উদ্দেশ্যকেই সিদ্ধ করেছে। তবে উচ্চনৈতিক আদর্শ স্থাপন করতে গিয়ে তিনি তাত্ত্বিক নীরস জগতে হারিয়ে যাননি। বরং সমালোচক নবেন্দু সেনের ভাষায় - 'গুরুগিরি মুক্ত আনন্দময়তাই হল যোগীন্দ্র-সাহিত্যের প্রথম কথা'। [১০]

(২)

যোগীন্দ্রনাথের খ্যাতি মূলত শিশুশিক্ষা মূলক গ্রন্থের পথিকৃৎ রূপে। বাঙালি শিশুর (এমনকি অসমীয়া ভাষায় পর্যন্ত শিশুরা প্রথম শেখে, 'অ-অজগর আছে লবি/আ-আমটো মই খাম পাবি'।) প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হত যোগীন্দ্রনাথের হাত ধরে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় মূলত ছোটদের মতো করে লেখা প্রারম্ভিক ব্যাকরণ। ভাষার গাম্ভীর্য শিশুর কানে ধ্বনি ঝঙ্কার তুললেও শিশুর হৃদয়ে পৌঁছনোর পক্ষে তা বেশ কঠিন। অন্তঃপ্রবাহিত ছন্দের পরিবর্তে অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত ছন্দোবদ্ধ, সরল, নির্মেদ এমন এক গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল যা বাঙালি শিশুর মস্তিষ্কে নয়, হৃদয়ে সুপ্রোথিত করবে তার মূল। যোগীন্দ্রনাথের 'হাসিখুশি' (১ম ভাগ, ১৮৯৭) সেই অভাব পূর্ণ করলো। বিজন বিহারী ভট্টাচার্য বলেছেন—''বিদ্যাসাগর আমাদের হাতে খড়ি দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যোগীন্দ্রনাথ সঙ্গে - সঙ্গে ছিলেন বলিয়া বিদ্যাস্থানে ভয়ের দৈত্যটা মাথাচাড়া দিতে পারে নাই।'' [১১]

'হাসিখুশি'তে বাংলা বর্ণমালা ও মাত্রার পরিচয়, সংখ্যাগণনা, মাস ও বারের নাম, যুক্তাক্ষর রয়েছে। বাংলা লিপিমালার ধ্বনি এবং তার লেখ্যরূপ বর্ণের সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে যোগীন্দ্রনাথ এমন এক ছড়া সৃষ্টি করলেন, যা বাংলার শিক্ষা জগতে যুগান্তর নিয়ে এল। 'কর, খল'র পরিবর্তে বাঙালি শিশু 'হাসিখুশি'তে বলল —

'অ-এ অজগর আসছে তেড়ে,
আমটি আমি খাব পেড়ে।
ইঁদুরছানা ভয়ে মরে,
ঈগল পাখি পাছে ধরে।
উট চলেছে মুখটি তুলে,

দীর্ঘ ঊ-টি আছে ঝুলে।
ঋষি মশাই বসেন পূজায়,
৯-কার যেন ডিগ্‌বাজি খায়।
এক্কাগাড়ি খুব ছুটেছে,
ঐ দেখো না চাঁদ উঠেছে।
ওল খেয়ো না, ধরবে গলা,
ঔষধ খেতে মিছে বলা।'

পরিচিত শব্দাবলীর মধ্যেই শিশু তার নিজস্ব জগৎ খুঁজে পেল। ফলে চিরকালের জন্য তাঁর স্মৃতিতে বাঁধা পড়ল 'প্রাইমার।'

সহজ সরল ভাষা এবং পরিচিত জগৎ তাঁর শিশুশিক্ষার মূলপাঠ। বর্ণশিক্ষা দিতে গিয়ে উদাহরণরূপে বেছে নিয়েছেন বিশেষ্য। যেমন 'আ' কারের বোধ গড়ে তুলতে লেখেন —

'শশা আর কলা খাও
খাও পাকা আম,
আনারস ডাব আতা
আর কলা জাম।'

'অ' এবং 'আ' স্বরধ্বনি বোঝাতে তিনি একদিকে যেমন বেঁছে নেন কাকের সুপরিচিত 'কা - কা' ডাক, তেমনি পশুপাখিদের সঙ্গে বাস্তব পরিচয়ের উদ্দেশ্যে বলেন —

'লম্বা কেশর ফুলিয়ে তোলা,
গম্ভীর মেজাজ,
রাজার মত চেহারা, তাই
নামটি পশুরাজ।'

বলাই বাহুল্য, এখানে পশুরাজ হলেন সিংহ। অজানা-অচেনা চমরী গাইয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখেন —

তিব্বতের গরু
বুনো ভেড়ার মত শিং,
নাক, চোখ, ভুরু,
সিংহের মত ঝাঁকড়া কেশর,
পিছন দিক সরু।

আর 'বাঘের মাসি' বেড়াল তাঁর কলমে —

'বিল্লীরাণী নেহাত তুমি
কেউ-কেটা নও,
কোন্ বংশে জন্ম, সেটা
ভুলে কেন রও।'

পরিচিত ও অপরিচিত জগতকে এইভাবে শিশুদের সামনে উপস্থিত করে তিনি সমগ্র বিশ্বকে শিশুদের হাতের মুঠোয় এনে দিতে চাইলেন।

যোগীন্দ্রনাথের মূল লক্ষ্য ছিল ছোট ছেলে মেয়েদের কাছে পঠিত বিষয়বস্তুকে মনোগ্রাহী করে তোলা। এই কারণে তিনি তাঁর ছড়া-কবিতায় গল্পের আমেজ ছড়িয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে 'গল্পসঞ্চয়ের' ভূমিকায় জানিয়েছেন —

'ছেলেদের যেমন চাই দুধ-ভাত, তেমনি চাই গল্প। আজকের দিনে মা-মাসীরা গেছেন গল্প ভুলে, কিন্তু ছেলেরা আজও বলবে গল্প বলো। গল্পর দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যারা কোমর বেঁধেছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য যোগীন্দ্রনাথ।'

সংখ্যা শেখাবার জন্য রচিত 'হারাধনের দশটি ছেলে' ছড়াতে এই গল্পের আভাষ পাওয়া যায়। কিভাবে হারাধন দশ পুত্রের মধ্যে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় একে একে নয়টি ছেলেকে হারায় এবং অবশেষে মনের দুঃখে তার দশম পুত্রটি বনান্তরী হয়, তারই ছন্দবদ্ধ রূপ এই ছড়া। অনুরূপ ভাবে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে পান্তা বুড়ির গল্প (রাঙাছবি), সাত ভাই চম্পা (হাসি ও খেলা), টুনটুনি ও বেড়ালের গল্পে (খেলার সাথী) নিটোল গল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর টুনটুনির গল্প শুরু হয় এই ভাবে - 'এক যে ছিল টুনি, তার ছিল এক বেগুন গাছ। সেই গাছে আকশি দিয়ে রোজ রোজ সে বেগুন পাড়তো। বেগুনের বোটায় কাঁটা থাকে তা তো জান। একদিন হয়েছে কী, টুপ করে একটা বেগুন পড়ে টুনির পিঠে কাঁটা ফুটে গেল। অমনি ব্যাথায় ছটফট করতে করতে সে নাপিতের বাড়ি ছুটল।' শিশু শিক্ষার সূচনালগ্নে এই ধরণের ক্ষুদ্র আখ্যান ছোটোদের সম্মোহিত করে রাখতো।

যোগীন্দ্রনাথের প্রায় প্রতিটি গ্রন্থই সচিত্র। এর কারণ ঐ শিশু মনোজগতে রঙের নেশা জাগানো। তাঁর 'জ্ঞানমুকুল' প্রসঙ্গে ১৩০০ সনের মাঘ মাসে 'সাথী' পত্রিকায় তিনি ছোটদের বইয়ের অলংকরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেছেন —

"গল্পচ্ছলে সুন্দর সুন্দর চিত্রের সাহায্যে, সকল বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারিলে, শিক্ষা অতিশয় সহজ হয়, এবং তাহার ফল ও হয় আশানুরূপ। ..... বালক - বালিকারা ইহাতে শিক্ষা ও আমোদ উভয়ই পাইবে।"

বইতে মনোরম চিত্র ও সুন্দর অলংকরণের প্রয়োজনে তিনি প্রমদাচরণ সেনের 'সখা' পত্রিকার

মুদ্রণযন্ত্রের ব্লকগুলি কিনে নেন। বিদেশ থেকেও এল কিছু ব্লক। লিথোগ্রাফে তৈরী ব্লকগুলির জন্য ছবি এঁকে দিতেন 'স্টেটস্‌ম্যানে'র বিখ্যাত চিত্রকর পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, বন্ধুবর উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং বাণিজ্যিক ছবির বিখ্যাত শিল্পী যতীন্দ্রনাথ সেন। এই ছবিগুলি যোগীন্দ্রনাথের গ্রন্থে অপরিহার্য। এমনকি ছবির প্রয়োজনেই লিখেছেন অনেক লেখা। যেমন 'ছবির বই' গ্রন্থের 'শোভার কুকুর' লেখাটি একটি সুদৃশ্য কুকুরকে অনুসরণ করে লেখা। কুকুরের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখাটি শুরু হয়েছে এইভাবে —

"কুকুরের প্রতি চাহিয়া দেখ, চোখ দুটি কি সুন্দর! চাহনিতে সেই
মমতা যেন ফুটিয়া রহিয়াছে।'

চিত্রের মাধ্যমে বর্ণের ছড়া লিখেছেন তিনি। এই রেখাক্ষর বর্ণমালাতে তিনি বিভিন্ন বর্ণকে মানুষরূপে অথবা পশুরূপে কল্পনা করে, তাদের ক্রিয়াকলাপের কৌতুকময় চিত্র উপহার দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রেই ছড়া সম্পূর্ণ হয়েছে ছবির মাধ্যমে। যেমন — 'গঙ্গারামের খুড়ো', 'ছেলের চিঠি', 'বিয়ে পাগলা' ইত্যাদি। সংখ্যা চেনাবার জন্য 'হাসিখুশি'তে তিনি '১' থেকে '৯' পর্যন্ত সংখ্যাগুলিকে সঙ্ সাজিয়েছেন। এই উদ্ভাবনী শক্তির জন্যই তিনি বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রথম যথার্থ সাহিত্যিক।

যোগীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় কীর্তি তাঁর শিশুশিক্ষামূলক গ্রন্থগুলি। শিশুদের মানসিক গঠনে একই সঙ্গে তিনি ব্যবহারিক জ্ঞান এবং আনন্দের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন বলেই তিনি অদ্যবধি বাংলার শ্রেষ্ঠ 'প্রাইমার' রচয়িতা। সময়ের কালগ্রাস তাঁর কৃতিত্বে ছায়া ফেললেও, সম্পূর্ণরূপে তা গ্রাস করতে পারেনি। কারণ তাঁর গ্রন্থগুলির সহজবোধ্যতা। 'ছেলে-মেয়েদের জন্যে লেখা কত বই এল আর গেল। যোগীন্দ্রনাথের বইগুলি এখনো বেঁচে আছে। এখনো জনপ্রিয়। শেখার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও আমাদের প্রয়োজন ফুরোয় না।'

(৩)

শিশুশিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থের প্রণেতা যোগীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তার অন্তরালে চাপা পড়ে আছেন কবি-সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ। শিক্ষা প্রসারের পাশাপাশি যাঁর আত্যন্তিক ইচ্ছে ছিল সাহিত্য সাধনার নির্মল আনন্দে অবগাহন করার। তাঁর শিশুসাহিত্যে এই আনন্দধারার চোরাস্রোত বহমান। তিনি ভোলেন না—'শিশুদের মধ্যে যথেষ্ট কাব্যরসগ্রহিতা আছে এবং তারা উপদেশকে ভালোবাসে না।' তাই শিশুদের জন্য রচনা করলেও তাঁর ছড়া কবিতায় একধরনের সৃষ্টিশীল সৌন্দর্যরস লক্ষ করা যায়। তিনি যখন লেখেন—

'আয় রে ময়ূর আয় —
প্যাখম ধরে নেচে নেচে খাদুর কাছে আয়?
আসতে যেতে ঘুঙুর বাজে, সোনার নূপুর পায়।'

ময়ূরের সঙ্গে ছোটরাও যেন নেচে ওঠে। এই সহজাত আনন্দই যোগীন্দ্রসাহিত্যের মূল সুর।

ছড়া ও কবিতার জগতে যোগীন্দ্রনাথের প্রবেশ 'বিকাশ' ও 'দীপ্তি' কাব্যগ্রন্থদুটির মধ্য দিয়ে। কিন্তু ছোটদের জন্য তিনি প্রথম কবিতা লেখেন ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে। ভিখারীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত 'কবিতা - কণিকা'তে। এখানে তাঁর চারটি কবিতা স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'চোরের দুর্দশা।' ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত 'হাসি ও খেলা।' এরপর কবিতা ও ছড়াকে কেন্দ্র করে লেখেন 'হাসিখুশি' (১৮৯৭), 'খুকুমনির ছড়া' (১৮৯৯), 'হাসিরাশি' (১৮৯৯) । বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে উত্তাল বঙ্গদেশে শিশু কিশোরদের মধ্যে স্বদেশপ্রীতি জাগরণের উদ্দেশ্যে লিখেছেন 'বন্দেমাতরম'। এই গ্রন্থগুলিতে কখনও তার মৌলিক প্রতিভার স্ফূরণ ঘটেছে, আবার কখনও বা লোকপ্রচলিত ছড়ার পুনর্নির্মাণে যত্নশীল হয়েছেন তিনি। এই কবিতা ছড়াগুলিতে তাঁর সরস ও মুক্ত মনের পাশাপাশি প্রায়শই এমন উদ্ভট এক জগতের সন্ধান পাওয়া যায়, যা সুকুমার পূর্ববর্তী যুগের বিচিত্র আজগুবি সাহিত্যের সম্ভবনাময় উজ্জ্বল দিকটি প্রকাশ করে।

যোগীন্দ্রনাথের ছড়া কবিতায় মূল লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল, সহজ ও নির্মল আনন্দদান। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা প্রকাশিত হয়েছে কৌতুকরসকে অবলম্বন করে। কাউকে আঘাত করে নয়, বরং মজার মজার পরিস্থিতি ও চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এই কৌতুকরসের জন্ম। যেমন 'হাসিরাশি'র 'পেটুকদামু' কবিতাতে পেটুকদামু কলা খাবার লোভে করিম মিঞাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে। কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে করিম মিঞা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিপদে পড়ে 'দামু'। কেননা, কলার খোসায় পা পিছলে 'করিমমিঞা' পড়ে দামুরই কাঁধে। ফলে—

"হাঁউ মাঁউ খাঁউ করে দামু, ঠোঁট দুখানি কাঁপে;
পিঠটা বুঝি গেল ভেঙে, করিম মিয়ার চাপে!
পেটের চেয়েও পিঠের জ্বালা, দামু কেঁদে সারা,
তার প্রতিদান পায়, যেমন, কাজটি করে যারা।"

'দুষ্টতিনু' কবিতায় তিনুর কাজই হল 'ফাঁকি দিয়ে গাড়ী চড়া।' তাই কোচম্যানকে ফাঁকি দিয়ে সে চেপে বসত গাড়ির পিছনে। একদিন হাতেনাতে তাকে ধরতে কোচম্যান যেই গাড়ির ছাদের উপর দিয়ে গদীয়ান তিনুর দিকে চুপিসাড়ে এগিয়ে যায়। তিনু অমনি গাড়ির নিচ দিয়ে চলে যায় গাড়ির সামনে। কোচবাক্সে বসে লাগাম ধরে —

'কোচম্যান ভ্যাবাচ্যাকা
সারাগায়ে ঘাম;
মহাখুশি তিনকড়ি
ধরিল লাগাম।
তারপরে জোরে ঘোড়া দিল ছুটাইয়া,
পথে পড়ে হাহাকার করে বুড়ো মিয়া।'

দুষ্টু - চঞ্চল স্বভাবের পাশাপাশি শিশু চরিত্রের আত্মভোলারূপের মধ্যেও খোঁজ পাওয়া যায় কৌতুক রসের। 'কাজের ছেলে' কবিতায় মা ছেলেকে যে মুদি সদাই আনতে দিয়ে ছিল তা এইরকম —

"দাদখানি চাল, মুসুরির ডাল,
চিনিপাতা দৈ,
দুটো পাকাবেল সরিষার তেল
ডিমভরা কৈ।"

কিন্তু পথের মাঝে সমবয়সী ছেলেমেয়েদের খেলা ও কাজ দেখতে দেখতে ছেলেটি এতই মশগুল হয়ে পড়ে যে, সে যখন দোকানে ফর্দ পেশ করে তা হয়ে দাড়ায় এইরকম —

" দাদখানি বেল, মুসুরির তেল
সরিষার কৈ,
চিনিপাতা চাল, দুটো পাকা ডাল
ডিমভরা দৈ।

চপলমতি ছেলে-মেয়েদের পাশাপাশি জন্তু-জানোয়ারের রাজ্যেও তাঁর মজার পশরা সাজানো। 'লোভের সাজা' কবিতায় গাছের সঙ্গে বাঁধা জিরাফ খেতে পশুরাজ সিংহ লাফ দিলেন। সিংহিমশাই গাছচিরে তাতে আটকা পড়লেন—

"চেপটে গিয়ে সিঙ্গী মশাই করেন হাইফাঁই,
ইঁদুর যেমন কলে পড়ে তাঁরও দশা তাই।"

'সাপ নয় তো যম' কবিতায় একটি দুষ্টু বাঁদরের দুষ্টুমির জন্য উচিৎ সাজার চমৎকার বন্দোবস্ত রয়েছে। একটি সাপের উপর টব চাপা দিয়ে মজা দেখবার জন্য তার উপর চেপে বসে বানর মহারাজ—

"বাহবা কি মজা!
সিংহাসনে বসে আছি
কিষ্কিন্ধ্যার রাজা"

টবের ফুটো দিয়ে সাপটি ছোবল মারে বাঁদরের লেজে। ফলে —

"উঃ জ্বলে গেলুমবাপ্।
লেজের গোড়ায় ছুবলেছে
হতভাগা সাপ!
প্রাণটা বুঝি যায়!
লেজটা ফুলে কলাগাছ
করি কি উপায়।"

নির্মল হাস্যরস পরিবেশনের পাশাপাশি প্রতিমুহূর্তে তিনি ছোটদের কতর্ব্য ও নীতিবোধ সম্পর্কে সচেতন করেন। উনিশ শতকের প্রভাব তখনও তাঁর মনকে সক্রিয় ছিল। তাই খারাপ কাজের পরিণাম ভোলেন না। তবে তাঁর কবিতায় নীতি কথা যে প্রবল হয়ে ওঠে না, তা ঐ স্নিগ্ধ কৌতুকের জন্যই। কবিতার সঙ্গে অলংকরণরূপে ব্যবহৃত ছবিগুলি এই কৌতুককে ষোলো কলায় পূর্ণ করেছে।

কৌতুকরসের পাশাপাশি যোগীন্দ্রনাথের রচনায় ছোটদের প্রতি বাৎসল্য রসেরও পরিচয় পাওয়া যায়। শিশুর সরল মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি স্বর্গীয় পবিত্রতা অনুভব করেন —

'এমন শোভা আর কি আছে
সকল শোভার সার!
স্বর্গ যদি কোথাও থাকে
এই তো ছবি তার!'

শুধুমাত্র শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্যই লেখেন —

"রুটি যাবে শ্বশুর বাড়ি
সঙ্গে যাবে কে
সঙ্গে যাবে চিনি মাখন
নাচতে লেগেছে।
চিনি নাচে, মাখন নাচে
আর নাচে বাজু,
বাজুর বাবা বলরাম
মস্তবড় পাজু।

'পশুপাখি'র সঙ্গে পরিচয় করতে গিয়েও তিনি ছড়া ও ছবির সাহায্য নিয়েছেন। 'নূতন ছবি' গ্রন্থে 'শিম্পাঞ্জি'র পরিচয় দিয়ে বলেন —

"এরা বনমানুষের জাত,
পায়ের চেয়ে খানিক আরো
লম্বা এঁদের হাত।"

কবিতা ও ছড়াকে আশ্রয় করে বাংলা সাহিত্যে যোগীন্দ্রনাথ নতুন একটি জিনিসের আমদানী করলেন। পাশ্চাত্যে যা 'Nonsense vers' তাকেই উপহার দিলেন যোগীন্দ্রনাথ — বাংলা শিশুসাহিত্যে যোগীন্দ্রনাথই প্রথম উদ্ভট বা আজগুবি সাহিত্যের রূপকার। এপ্রসঙ্গে গবেষিকা ব্রততী চক্রবর্তী বলেছেন —

"বাংলা সাহিত্যে আজগুবি ছড়া ও কবিতার প্রথম রূপকার ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের আশ্বিন মাসে 'মুকুল' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'ফড়িংবাবুর বিয়ে' প্রথম আজগুবি ছড়া।" [১২]

মুকুল পত্রিকায় প্রকাশের সময় ছড়াটিতে লেখকের নাম ছিল না। পরে 'হাসিরাশি' গ্রন্থে এই ছড়াটি তিনি সংকলন করেন। অবশ্য 'ফড়িংবাবুর বিয়ে' ছড়ার ক্ষেত্রে একটি প্রচলিত ছেলে ভুলানো ছড়ার প্রভাব সক্রিয় ছিল। যোগীন্দ্রনাথ লিখেছেন — 'ফড়িংবাবুর বিয়ে / টিকটিকিতে ঢোলক বাজায় / ধুনুচি মাথায় দিয়ে।' আর ছেলে ভুলানো ছড়াটি হলো — 'কুকুরে বাজায় টুমটুমি / বানরে বাজায় ঢোল, / টুনটুনিয়ে টুনটুনালো, / ইঁদুর বাজায় খোল।' যোগীন্দ্রনাথের প্রথম মৌলিক আজগুবি ছড়া প্রকাশিত হয় 'মুকুল' পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত 'কালা হারে কি ধলা হারে' কবিতায় দুই বিড়ালের ঝগড়া এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

মানুষ, পশুপাখি ও বাস্তব পৃথিবীর অস্বাভাবিকত্ব তাঁর উদ্ভটরস সৃষ্টির প্রধান উপকরণ। মানুষের অস্বাভাবিকতা, তার দৈহিক অসংগতির কৌতুকবহ উপস্থিতি তাঁর কবিতায় সুলভ। 'ভারী সুবিধা', 'নাক সাবধান', 'দোলনা', 'বাপরে বাপ' কবিতায় মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্বাভাবিকতাকে কেন্দ্র করে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে।

'ভারী সুবিধা' কবিতায় গুরু মশাইয়ের নির্মমতার বলি হয় দাশু। গুরুমশাই তার কানটেনে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা করেদেন। এই লম্বা কান কিন্তু তার কাছে শাপে বর হয়ে দেখা দিল। সেই লম্বা কানকে বর্ষাকালে ছাতা, শীতে লেপ, আর গরমকালে তালপাখার মত ব্যবহার করে সে — 'পাখার মতো কানের হাওয়া, খান বসে বাবু।" 'নাক সাবধান' কবিতায় গদাই একজনের খাঁদা নাক দেখে হেসেছিল বলে বারো হাত লম্বা নাকের অধিকারী হয়। 'বাপরে বাপ' কবিতায় গাছকাটার শাস্তিরূপে বনদেবীর অভিশাপে দুটি ছেলে গাছ হয়ে যায়।

যোগীন্দ্রনাথ সুকুমার রায়ের বহুপূর্বেই বাংলার প্রাণীজগতে যুগান্তকারী বিপ্লব এনেছেন। যোগীন্দ্রনাথ বাংলার শিশুপাঠকদের কাল্পনিক আজগুবি প্রাণী উপহার দিলেন। 'খুকুমনির ছড়া' বইতে যে উদ্ভট আশ্চর্য প্রাণীটির সন্ধান পাওয়া যায়, তা অদ্যবধি বাংলাসাহিত্যে তুলনা রহিত —

'হাট্টিমা টিম্‌টিম্‌
তারা মাঠে পাড়ে ডিম
তাদের খাড়া দুটো শিং
তারা হাট্টিমা টিম্‌টিম্‌।'

আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে[১৩] এই আজব প্রাণীটি 'পক্ষী' শ্রেণির। কিন্তু আসলে তা শামুক। 'খুকুমনির ছড়া'র অন্যান্য আজব প্রাণী হল — 'একানেড়ে' (এটি একপ্রকার ভূত), ড্যামরা চোখো, হুসুর-মসুর। ছোটদের ভয় দেখানোই এদের কাজ। 'হিজিবিজি' গ্রন্থের 'আজব - চিড়িয়াখানা'

কবিতায় একটি সঙ্কর প্রাণীর বর্ণনা আছে —

"বাঘের মুখে ঝুলতো যদি, রামছাগলের দাড়ি,
শূয়োর যদি পাখির মত, উড়তো ডানা নাড়ি;
গাছের ডালে বসে বাঁদর গোঁফে দিত চাড়া,
ভূতুম পেঁচা আসত ছুটে, বাগিয়ে বিষম দাঁড়া,
উৎসাহেতে ধোপার গাধা গাইত যদি গান,
দেখে শুনে চম্‌কে তবে, উঠত না কার প্রাণ!"

এই প্রাণীরাই পরবর্তীকালে সুকুমারের 'বকচ্ছপ', 'গিরিগিটিয়া', 'কুমড়োপটাশ' প্রভৃতি প্রাণীর প্রেরণা। বাস্তব পৃথিবীর চেনাপরিচিত দৃশ্য সামান্য উল্টে গেলে যে বিচিত্র জগৎ অপেক্ষা করে আছে, সেই সম্ভবনা উস্কে দেন তিনি। তাঁর 'মজার মুল্লুক', 'উল্টোবুঝলি রাম,' 'ছেলে ও বুড়ো' প্রভৃতি কবিতায় এই বাস্তবোতীর্ণ আজগুবি জগতের সন্ধান মেলে। 'মজার মুল্লুক' কবিতাতে তিনি যে মজার দেশে পৌঁছেদেন পাঠককে, সেখানে —

"জিলীপি সে তেড়ে এসে
কামড় দিতে চায়,
কচুড়ি আর রসগোল্লা
ছেলে ধরে খায়!"

আবার —

"পায়ে ছাতি দিয়ে লোকে
হাতে হেঁটে চলে
ডাঙায় ভাসে নৌকা জাহাজ
গাড়ী ছোটে জলে।'

এমন সর্বনেশে দেশের সন্ধান যোগীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন উইলিয়াম ব্রিগটি র‍্যাণ্ডস-এর 'লিলিপুট লাইভ' (১৮৬৮) বইতে। এই গ্রন্থের 'If the butterfly courted the bee' র অংশত প্রভাব রয়েছে 'মজার মুল্লুকে'।

কবিতার পাশাপাশি 'আষাঢ়ে স্বপ্ন অথবা জানোয়ারের মেলা' বইতে জানোয়ারদের ক্রিকেট খেলা, ফুটবল খেলা, কিংবা 'টুনটুনির গল্পে' টুনটুনি পাখির মজার কাণ্ডকারখানার অদ্ভুত বিবরণ আছে। এই অবাস্তব জগৎ শিশু কিশোরদের কাছে অসম্ভব ও অপিরিচিত হয়ে ওঠে না। তার কারণ, লেখক এমন সহজ ও হৃদয়গ্রাহী করে তাদের কথা বলেন যে, তা সম্ভব - অসম্ভবের সূক্ষ্ম রেখা মুছে দেয়।

(৪)

শিশুশিক্ষার পাশাপাশি ছোটদের সাহিত্যরুচির প্রতি সজাগ দৃষ্টি ছিল যোগীন্দ্রনাথের। শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য যে কাহিনিগুলি উপস্থিত করেছেন তিনি, সেখানে আগাগোড়া প্রাধান্য পেয়েছে শিশুমনস্তত্ত্ব। বাংলা শিশুসাহিত্যের ইতিহাসে তিনিই অন্যতম বিরল ও ব্যতিক্রমী কাহিনিকার, যার রচনায় কৈশোরিক বুদ্ধিবৃত্তির চাতুর্য দেখা যায় না। ফলে ভাবনার পরিবর্তে তাঁর গল্পগুলি শিশুদের ভালোলাগা উপহার দেয়। জীবজন্তু কেন্দ্রিক আজগুবি জগতের পাশাপাশি তিনি পৌরাণিক কাহিনিও পরিবেশন করেছেন।

যোগীন্দ্রনাথের 'আষাঢ়ের স্বপ্ন অথবা জানোয়ারের মেলা' গ্রন্থে জন্তুজানোয়ারের উদ্ভট ও আশ্চর্য চারিত্রিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। খানিকটা আত্মকথনের ভঙ্গিতে লেখা এই গল্পটি স্বপ্নলোকের কাহিনি। সারাদিন আলিপুরের চিড়িয়াখানায় ঘুরে সন্ধ্যার ক্লান্তিতে দুচোখে ঘুম জড়িয়ে আসে গল্প কথকের। স্বপ্নের মধ্যে এক আশ্চর্য দেশ। জানোয়ারের রাজ্যে পৌঁছায় সে। 'জানোয়ারের রাজ্যের ব্যাপারগুলি মানুষের সমাজের মতোই। তারা পোষাক পরে, অফিসে যায়। ' চতুর্ভুজ নামে একটি উল্লুক জানোয়ারের রাজ্যের সঙ্গে লেখকের পরিচয় ঘটায়। সেখানে জানোয়ারদের রাজার ছেলের বিয়ে। সেই উপলক্ষে রাজবাড়ির সম্মুখে 'লোকে লোকারণ্য অর্থাৎ জানোয়ারে জানোয়ারণ্য'। সেখানে ভাল্লুক বনাম সিংহের ক্রিকেট ম্যাচ চলে। ফুটবল খেলার শেষে টাগ অব ওয়ার হয়। শেষপর্যন্ত পিলেচমকানো সমবেত জাতীয় সংগীতে সমাপ্তি হয় অনুষ্ঠানের —

"ছোটবড় পার করেছি
হাজার হাজার
জোর যার মুল্লুক তার
এই নীতি সার।"

রুডলফ্ এরিখ র‍্যাপস-এর লেখা 'The Adventures of Baron Munchhausen' বইটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে লেখা এই বইটিতে বিচিত্র চরিত্রের হট্টমেলা বসেছে। আছেন পশুরাজ, পুলিশ সার্জেন্টরূপী হ্যাট-কোর্ট পরা 'বুলডগ', রাজবাড়ির প্রহরী পেঙ্গুইন, উল্লুক চতুর্ভুজ, ল্যাজমোটা ডাক্তার, আর তার 'লেজছেঁড়া রোগ,' শিক্ষার নামে চালিয়াতির উদাহরণও এখানে অপ্রতুল নয়। বিদ্যাদিগ্গজ নামে ভাল্লুক পণ্ডিত এক ছাত্রকে কানধরে পাঠশালা থেকে কান ধরে তাড়ানোর মতলব আটেন, কেননা — 'ছোকরা দু'য়ে দু'য়ে যোগ করে পাঁচ লিখেছে।'

নির্বুদ্ধিতার জন্য মানুষকে প্রতিমুহূর্তে অপরের হাস্যাস্পদ হতে হয়। 'রামধন' গল্পে এমনই এক বোকা যুবক রামধন। সে বিধবার একমাত্র সন্তান। বয়স কুড়ি বছর। দীঘির পাড়ে লোকদের গর্ত খুড়তে দেখে সে 'পুকুর চুরি' হচ্ছে ভেবে সকলকে খবর দেয়, ফলে উপহাসের পাত্র হতে হয় তাকে। নিমু মোড়লের মেয়ে তার ধাক্কায় কুঁয়োতে পড়ে গেলে সে খবর দিতে যায় অন্যদের।

রামধনের মা তাকে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য মেয়েটির মৃতদেহ কুঁয়ো থেকে তুলে সেখানে একটি ছাগল ফেলেদিল। রামধন লোকজন জড়ো করে কুঁয়োতে নামে। কিন্তু মেয়েটিকে সে না পেয়ে জলের উপরে একেকবার ভেসে ওঠে আর বলে—

'হ্যাঁগো মেয়েটির কি দুটো শিং? ... তোমার মেয়ের
কি চারখানা ঠ্যাং? ... 'হ্যাগো তোমাদের মেয়ের
লেজটি কত বড়? আর তার বেশ লম্বা দাড়ি আছে কি?'

ডব্লিউ.এস. গিলবার্টে র 'The yarn of the Nancy Bell' অবলম্বনে লেখা 'কুমিরের বাপের শ্রাদ্ধ' গল্পটিও রসোত্তীর্ণ। 'কুমিরের বাপের' শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপস্থিত হয়েছে ব্যাঙ, ইঁদুর, বেড়াল, শেয়াল, চিতা, সিংহ। বানর পুরোহিতের মন্ত্রপড়ার দৌলতে ভর দুপুরেও শ্রাদ্ধ শেষ হয় না। শেষে খিদে সহ্য করতে না পেরে ইঁদুর ব্যাঙকে খেয়ে ফেলে। ইঁদুরের অভদ্রতাতে ক্ষিপ্ত হয়ে বিড়াল খেয়ে ফেলে ইঁদুরকে। এরপর একে একে শেয়াল বেড়ালকে, চিতা শিয়ালকে এবং সিংহ চিতাকে ভক্ষণ করে। তুষ্টচিত্তে সিংহ যখন অর্ধশায়িত, তখন —

"কুমির ভাবলে ভোজের ব্যাপার চুকেছে এখন নিজের যোগাড় দেখি। এই ভেবে পশুরাজকে সাপটে ধরে সে আপনার প্রকাণ্ড মুখের মধ্যে ফেলে দিলে।... খিদেয় কুমীরের পেট চুপ্‌সে এতক্ষন আমসি হয়ে ছিল, এখন সেটি ফুলে একেবারে ঢাকাই জালা।"

প্রাণী জগতের সঙ্গে পরিচয় সাধনের উদ্দেশ্যে লিখেছেন 'নূতন ছবি' 'ছোটদের চিড়িয়াখানা।' ১৯২৯ এ তাঁর বিখ্যাত শিকারকাহিনি 'বনে জঙ্গলে' প্রকাশিত হয়। বনবিহারী পশু এবং বনগমনকারী মানুষদের বিচিত্র পারস্পরিক সম্পর্কের কাহিনি বনজঙ্গলের বিষয়।' এটি মূলত সংকলন গ্রন্থ। যোগীন্দ্রনাথ ছাড়াও অন্যান্য লেখকের গল্প স্থান পেয়েছে এখানে।

বাংলাদেশের রূপকথা ও লোককথার উপস্থিতি লক্ষ করা যায় গল্প নাটিকায়। 'সাতভাই চম্পা' তে রূপকথার চেনা আঙ্গিকে সন্ধান পাওয়া যায়। দুঃখিনী রাণীর সাত ছেলেকে ছাঁইয়ের গাদায় পুঁতে ফেলার পর সেখানে সাতটি চাঁপাফুল ফোঁটে, শেষপর্যন্ত তারা ফিরে পায় মায়ের কোল। এই দৈবী মিলনই রূপকথার চেনা মটিফ।

লোকগল্পের টুনটুনি, শিয়াল, বাঘ, ছাগল এসে ভীড় করেছে তাঁর গল্পেও। তার হাতে স্নিগ্ধ কৌতুকে সজীব হয়ে উঠেছে এই লোক চরিত্ররা। 'টুনটুনি'র গল্প শুরু হয় এইভাবে —

"এই যে টুনী, তার ছিল এক বেগুনগাছ। সেই গাছে আঁকশি দিয়ে সে রোজ বেগুন পাড়তো। বেগুনের বোঁটায় কাঁটা থাকে। তা তো জানো। একদিন হয়েছে কি টুপ করে একটা বেগুন পড়ে টুনীর পিঠে কাঁটা ফুটে গেল। অমনি ব্যথায় ছটফট করতে করতে সে নাপিতের বাড়ি ছুটলো।"

ছোট টুনটুনিকে কেউ সাহায্য না করতে চাওয়ায় সে অনর্থ বাধিয়ে দিল। এমন কি রাজাও হারমানলো তার কাছে।

প্রবল পরাক্রমী হলেই যে তার কাছে হার মানতে হবে — এমন কুশিক্ষার পরিবর্তে সবলের পরাজয় ও দুর্বলের জয়ের নৈতিক দিকটি বার বার উঠে আসে শিশুসাহিত্যে। তাই বুদ্ধিমান শেয়াল অপদস্থ হয় ছোট্ট কাকড়ার কাছে (শেয়াল,/হাসি ও খেলা), লম্বাদাড়ি ছাগলের কাছে জব্দ হয় দুরন্ত বাঘ। 'লম্বাদাড়ি' গল্পে হিংস্র বাঘের যাতায়াতের পথে নদীর ধারে উঁচু পাহাড়ের উপর একদিন এসে দাঁড়ায় ছাগল —"ছাগলের খাড়া শিং আর লম্বা দাড়ি দেখিয়া বাঘের ত চক্ষু স্থির। সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল — লম্বা লম্বা দাড়ি ঘনঘন চোপানাড়ি তুই ভাইকেরে? ' লম্বা দাড়ি বলিল —

সিঙ্গীর মামা ভোম্বলদাস
বাঘ মেরেছি গোটাপঞ্চাশ
হাতার ভেঙ্গেছি পাশ;
আর ভিজে বাঘ খাব বলে
বনে করছি বাঘ!"

বলাইবাহুল্য এই অ-স্থানে বাঘ আর সাহস দেখানোর হিম্মত দেখায়নি।

যোগীন্দ্রনাথের উপস্যাসের সংখ্যা একটি। 'ছবি ও গল্পে' সংকলিত 'জয়পরাজয়' নামে উপন্যাসটি পরে 'মোহনলাল' নামে স্বতন্ত্র পুস্তকরূপে প্রকাশিত হয়েছে। পিতৃহারা মোহনলালের বিপথেগমন এই উপন্যাসের মূলকাহিনি। তবে যোগীন্দ্রনাথ যেহেতু ছোটদের জন্য লিখেছেন, তাই উচ্চনৈতিক আদর্শ স্থাপনের জন্যই শেষ পর্যন্ত চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটে মোহনলালের।

(৫)

যোগীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তার মূলকারণ তাঁর বিষয়বোধ। বিষয়কে তিনি সুচারু ভাষায় সহজভাবে গ্রন্থণ করতে পেরেছেন বলেই এই সাফল্য। ক্রিয়াপদ নির্মানে সাধু ভাষার ব্যবহার করলেও তিনি গম্ভীর তৎসম শব্দ ব্যবহার থেকে বিরত থেকেছেন। বরং সরল প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহার করে তিনি গদ্যে এমন প্রবহমানতার সঞ্চার ঘটান, যা শিশুদের মোহাবিষ্ট করে রাখে। বুদ্ধদেব বসু একারণেই বলেছেন — "যোগীন্দ্রনাথের রচনা একান্তভাবে অন্তঃপুরের, স্কুলের নয়, পাঁচজনকে ডেকে শোনাবার মতোও না, যেন মা-ছেলের বিশ্রাম্ভালাপের ভাষা—ঠিক তেমনি স্নিগ্ধ কোমল সহাস্য তাঁর গলার আওয়াজ। ঐ আওয়াজটিই ফরমাশ দিয়ে পাওয়া যায় না বলেই যোগীন্দ্রনাথের জুড়ি হল না।'

যোগীন্দ্রনাথই বিশুদ্ধচলিত বাংলায় ছোটদের উপযুক্ত গদ্য ভাষার ব্যবহার করে লিখলেন

'ভুলু ও বাঘা' নামে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা। এর বিষয়বস্তু অতি সাধারণ। কিন্তু ভাষার প্রকাশ ভঙ্গিটি লক্ষ্য করার মতো —

"ওকি খোকাবাবু, তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে 'ভুলোকে' মারতে যাচ্ছ! ছিঃ, অমন কুকুরটিকে কষ্ট দিতে আছে? তাই বুঝি সেদিন কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে বল্লে, 'ভুলো' তোমাকে কামড়াতে এসেছিল। তা আসবেনা কেন! তুমি তাকে মারবে, আর সে তোমাকে ভালোবাসবে? — তোমায় যদি কেউ বিনা দোষে মারে, তবে তুমি কি তাকে ভালোবাসতে পার? অপরকে ভালোনা বাসলে কখনও তার ভালোবাস পাওয়া যায় না, একথাটি যেন মনে থাকে।"

চলিত ভাষার পাশাপাশি তার লেখায় সাধুভাষ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যেমন —

"সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়
যেজন না বুঝে তারে ধিক্‌শত ধিক
বলিছে সোনার ঘড়ি টিক্ টিক্ টিক্।"

সাধু অথবা চলতি - যে রীতিই তাঁর কবিতার অবলম্বন হোক না কেন, এক ধরনের গল্পের আমেজ সেখানে ছড়িয়ে যায় বলেই তিনি আজও সমানভাবে জনপ্রিয়।

সবমিলিয়ে তাঁর সাহিত্যে একদিকে যেমন কৌতুকের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে তেমনি কোমল ও করুণ ভাবও এখানে ফুটে উঠেছে। তাই এই কাহিনিগুলি বাংলার আপামর শিশুহৃদয়ের আনন্দের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। নীরস স্কুলপাঠ্য পুস্তকের জগতে খুশির ঝলক্ এনেছিলেন বলেই তিনি অবিস্মরণীয়। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় —

'দু-তিন পুরুষ ধরে যোগীন্দ্রনাথের বইগুলি বাংলাদেশের শিশুমনের খোরাক জুগিয়ে এসেছে। ... যখন বাংলায় শিশুপাঠ্য আর কিশোরপাঠ্য বই ছিল না বললেই হয়, তখন যোগীন্দ্রনাথের অবির্ভাব যেন দেবতার আশীর্বাদ।'

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)

(১)

প্রতিভাবান মানুষেরা একাই বদলে দিতে পারেন পৃথিবী; যেমন ঠাকুরবাড়ির এক স্বভাব কিশোর তরুণ একাই বদলে দিয়েছিলেন বঙ্গীয় চিত্রকলার সুদৃশ্য পটচিত্র। নব্যভারতীয় চিত্রকলার জনক অবনীন্দ্রনাথ (১৮৭১-১৯৫১) তাঁর রূপদক্ষ মেজাজে তুমুল আলোড়ন তুলে হৈ চৈ বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন শিশুদের মনোজগতে। অসামান্য চিত্রল বর্ণনা, সরল বাক্-নৈপুণ্য এবং কাহিনির স্বকীয় উপস্থাপনরীতি তাঁকে শিশুসাহিত্যে স্থায়ী আসন দিয়েছে। রবিঠাকুর স্বয়ং সপ্রশংস মন্তব্যে তাঁর

অসামান্য প্রতিভাকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। বলতে দ্বিধা হয় না-'ছবির রাজা অবনঠাকুর ছবি লেখে'।

কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম। সময়কাল ৭ আগষ্ট ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ। পিতা গুণেন্দ্রনাথ, মাতা সৌদামিনী। গুণেন্দ্রনাথ ছিলেন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের খুড়তুতো ভাই। সেইসূত্রে রবিঠাকুর অবনীন্দ্রনাথের 'রবিকাকা'। ঠাকুর বাড়ির রীতি অনুযায়ী প্রথাগত শিক্ষার পরিবর্তে গৃহশিক্ষায় তাঁর বিদ্যার্জন। ছোটবেলায় নর্ম্যাল স্কুলে কিছুদিন এবং তারপর সংস্কৃত কলেজে পড়াশুনা চলে। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্বেই কলেজত্যাগ। কারণ, তাঁর নিজের ভাষায় —

> *"কলেজের গায়ে অমন যে গোলদীঘির সবুজঘাস, ফুলগাছ দেওয়া বাগান, সেটার দিকের প্রবেশ-পথের জানলাগুলো, গরাদ আঁটা ফটকের তালা কাউকে খুলে দিতে দেখিনি, কাজেই কাঁচা বয়সেই কলম-সরস্বতীর একটা চমৎকার বন্দনা লিখে বিদ্যামন্দিরের এনট্রানস থেকেই সরে পড়তে আমি একটুও লজ্জাবোধ করিনি।"*

এখানেই আশ্চর্য মিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। বাঁধনহারা উচ্ছ্বাস, সৃষ্টিছাড়া মনকে যখনই নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষার বেড়াজালে আটক করার ষড়যন্ত্র তাঁরা টের পেয়েছেন, তখনই ছিন্ন করেছেন নিয়মতন্ত্রের শৃঙ্খল। একারণেই তাঁদের সাহিত্যে বাঁধভাঙা মুক্তির উচ্ছ্বাস। অবনীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্যেও এই মুক্তির পাগল হাওয়া। তাঁকেই সমৃদ্ধ করেছে তাঁর অনুভবী শিল্পী মন। গভর্ণমেণ্ট আর্টকলেজের ছাত্র অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিশুসাহিত্যে ছড়িয়েদিয়েছেন রঙের বর্ণালী।

ছবির জগতের মানুষ অবনীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্যে আগমন মূলত রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা ও পরিকল্পনাতেই। অবনীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন —

> *"কথা উঠল, শিশুদের জন্য কিছু করা যাক। রবিকাকার মাথায় প্রথম এল, একটা সিরিজ বার করা যাক। নাম দেওয়া যাক বাল্যগ্রন্থাবলী সিরিজ। তখন শিশুদের পড়বার মত বই ছিল না। তিনি বললেন "তুমি গল্প লেখো"। আমি ভয় পেলুম। কারণ ওসব আমার আসে না"।*

লেখা হল 'শকুন্তলা' (১৮৯৫)। মূলত অনুবাদ হলেও তাঁর লেখায় রূপকথা প্রবেশ করলো। 'অবনীন্দ্রনাথের লক্ষই ছিল চিত্রবিচিত্র কাল্পনিক ভাষায় রূপকথা রচনা করা'[১৪] পরবর্তী রচনায় রূপকথার আমেজ পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকলো। ইতিহাসের বাঁক থেকে লোকশ্রুতির চূর্ণ নির্বাচন করে তিনি পরিবেশন করেছেন ছোটদের রাজ্যে। এমন কি রামায়ণ বা বিবিধ লোককাহিনির পুনর্নির্মানেও তিনি অনবদ্য। কিন্তু কোথাও তা ভারাক্রান্ত হয়নি জটিল তত্ত্বকথায়। গম্ভীর ঐতিহাসিকের মতো তিনি সন তারিখের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়েন নি। বরং শিশুদের তাত্ত্বিক ভুবনের পরিবর্তে আনন্দের নির্মল বিশ্বে পৌঁছে দিতেই তিনি অভ্যস্ত।

অবনীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্য প্রচুর লিখেছেন। তার মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক রচনাই গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। অবনীন্দ্র প্রণীত সাহিত্য গ্রন্থগুলি নিম্নরূপ ঃ

শকুন্তলা (১৮৯৫),ক্ষীরের পুতুল (১৮৯৬), রাজকাহিনি (প্রথমখণ্ড ১৯০৯, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩১), ভূতপত্রীর দেশ (১৯১৫), নালক (১৯১৬), খাতাঞ্চির খাতা (১৯২১), বুড়ো অংলা (১৯৪১), ঘরোয়া (১৯৪১), জোড়াসাঁকোর ধারে (১৯৪৪), আলোর ফুল্‌কি (১৯৪৭) ,হংসনাম পালা (১৯৫১),মাসি (১৯৫৪),লম্বকর্ণ পালা (১৯৫৪),একে তিন তিনে এক (১৯৫৪),মারুতির পুঁথি (১৯৫৬),রংবেরং (১৯৫৮),চাঁইবুড়োর পুঁথি (১৯৫৯),কিশোর সঞ্চয়ণ (১৯৬০),হানাবাড়ি কারখানা (১৯৬৩),মহাবীরের পুঁথি (১৯৬৬),যাত্রাগানে রামায়ণ (১৯৬৯),বাদশাহী গল্প (১৯৭১)

অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

ভারতশিল্প (১৯০৯), পথেবিপথে (১৯১৮), বাংলার ব্রত (১৯১৯), প্রিয়দর্শিকা (১৯২১) , চিত্রাক্ষর (১৯২৯), বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী (১৯৪১), সহজচিত্র শিক্ষা (১৯৪৬), ভারতশিল্পে ষড়ঙ্গ (১৯৪৭), ভারতশিল্পে মূর্তি (১৯৪৭), আপন কথা (১৯৫৩), শিল্পায়ন (১৯৫৫)।

ইতিহাস, রূপকথা, অ্যাডভেঞ্চারের ত্রিবেণী সঙ্গম লক্ষ্য করা যায় অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্য গ্রন্থগুলিতে। কাহিনির পঙ্খিরাজে বসিয়ে তিনি ছোটদের নিয়ে যেতেন সুদূর কল্পনার রাজ্যে। গল্প পরিবেশনে তিনি বৈঠকী মেজাজ এনেছেন ষোলো আনা। ঠাকুর বাড়ির ছোট ছেলে মেয়েদের একদা গল্প শোনাতেন তিনি। জসীমুদ্দীন এ প্রসঙ্গে 'অবন ঠাকুরের দরবারে' জানিয়েছেন —

> *"অবনের গল্প বলার সেকী ধরণ। অবন যেমন ছবি আঁকেন, রঙ দিয়া মনের কথাকে চক্ষুগোচর করাইয়া দেন - তেমনি তাঁর গল্পের কাহিনিকে হাত নাড়িয়া ইচ্ছা মতো চোখ মুখ ঘুরাইয়া কোনখানে কথাকে অস্বাভাবিক ভাবে টানিয়া কোন কথাকে দ্রুতলয়ে সারিয়া তাঁর গল্পের বিষয় বস্তুকে চক্ষুগোচর করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। মাঝে মাঝে ইকিড়ি - মিকিড়ি কথা ভরিয়া শব্দের অর্থের সাহায্যে নয়, ধ্বনির সাহায্যে গল্পের কথাকে রূপায়িত করেন।"*

'ইকিড়ি-মিকিড়ি' শব্দে ছোটদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যই তিনি একের পর এক চিত্রধর্মী আখ্যান সৃষ্টি করেন। তিনি জানেন, তাঁর পাঠক বয়স্ক নয়, বরং পরম বিস্ময়ে যারা তাঁর গল্প মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনবে, তারা নির্ভেজাল শৈশবরাজ্যের বাসিন্দা। কান্নাহাসি চোখের জলে তাদের জগৎ—

> *"যারা কেবল শুনতে চায় আপন কথা, থেকে থেকে যারা কাছে এসে বলে গল্প বলো, সেই শিশু জগতের সত্যিকার রাজা-রানী, বাদশা-বেগম, তাদেরই জন্যে আমার এই লেখাপাতা ক'খানা। ... যারা বসে বসে গল্প শোনে গল্পের রাজা বাদশার মতো, কিন্তু, ছেঁড়া মাদুর, নয়তো মাটিতে বসে; আর*

গল্পের মাঝে মাঝে থেকে থেকে যারা বক্‌শিস দিয়ে চলে একটু হাসি কিম্বা একটু কান্না, মানপত্রও নয়, সোনার পদকও নয়, হয় একটু দীর্ঘশ্বাস, না একটুখানি ঘুমে ঢলো চাহনি!" (আপন কথা)

ছোটদের দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়ায় মূলত তিনধরনের প্রবণতার উপর গড়ে উঠল তাঁর শিশু সাহিত্য। প্রথম দিকে তিনি মন দিয়েছিলেন রূপকথার রাজ্যে। 'শকুন্তলা' (১৮৯৫), 'ক্ষীরের পুতুল' (১৮৯৬) আঙ্গিকগত দিক থেকে না হলেও ভাবগত দিক থেকে রূপকথা ধর্মী। এরপর তিনি ঝুঁকলেন ইতিহাসের রোমাঞ্চকর দিনগুলির দিকে। ইতিহাস ও লোকশ্রুতির সম্ভাব্য - অসম্ভাব্য রাজ্যে পৌঁছে দু-খণ্ডে গ্রন্থণ করলেন 'রাজকাহিনি' (১৯০৯, ১৯৩১)। 'বাদশাহী গল্প' (১৯৭১) রয়েছে এই স্তরে। আর শেষ স্তরে থাকবে তাঁর পুনর্নির্মাণের কাহিনিগুলো। 'রাজকাহিনি', বা 'শকুন্তলা'র প্রায় মূলানুগত্য পরিত্যাগ করে তিনি 'ভূতপত্‌রীর দেশে' (১৯১৫), 'নালক' (১৯১৬) , 'খাতাঞ্চিরখাতা' (১৯২১), 'বুড়ো আংলা' (১৯৪১), প্রভৃতি গ্রন্থে 'অ্যাডভেঞ্চার', ও রূপকথার মিশেলে দেশি ও বিদেশী সাহিত্যের যে জগৎ সৃষ্টি করেন, তা প্রকৃত অর্থেই সাহিত্যের পুর্ননির্মাণ। 'মারুতিরপুঁথি', 'চাঁইবুড়োর পুঁথি', কিংবা 'যাত্রাগানে রামায়ণ' একই কারণে কথনরীতির বৈচিত্র্যে ছোটদের সামনে দেশের ঐতিহ্যকে সার্থকভাবে তুলে ধরে। যেখান থেকে, যতটুকু উপাদান সংগ্রহ করে তিনি সাহিত্য নির্মাণ করেছেন, তা এই দেশীয় পরিবেশকেই তুলে ধরেছে। ফলে তিনি তাঁর সমস্ত লেখনীর সৌজন্যেই তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

(২)

রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় অবনীন্দ্রনাথ ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে 'শকুন্তলা' রচনা করেন। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটক ও মহাভারতের কাহিনি তাঁর হাতে প্রায় রূপকথায় পর্যবসিত হয়েছে। এর পরের বছরই তিনি লেখেন 'ক্ষীরের পুতুল'। এটি নির্ভেজাল রূপকথা। তবে তার উৎস বাংলার লোককথা থেকেই। 'শকুন্তলা' কিংবা 'ক্ষীরের পুতুল' -এ অবনীন্দ্রনাথ যে রূপকথার জগৎ উন্মোচিত করেছেন, তা হঠাৎই খেয়ালের বশে নয়। বরং একধরণের পরিকল্পনা ছিল এর পিছনে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন 'চিত্রবিচিত্র কাল্পনিক কথা ও রূপকথা' সংগ্রহ করে তা দিয়ে শিশুসাহিত্য নির্মাণ করতে। যে কারণে 'বাল্যগ্রন্থাবলী' সিরিজের পরিকল্পনা। অবনীন্দ্রনাথ 'চিত্রধর্মী' রচনায় প্রাণিত হয়েছিলেন তাঁর চিত্রকর স্বভাবের জন্যই। আর তাঁর রূপকথার জগৎ তৈরি করে দিয়েছে তাঁর শৈশব। স্বভাবলাজুক নিঃসঙ্গ অবনীন্দ্রনাথের শৈশবের প্রধান আশ্রয়ছিল একতলার সিঁড়ি ঘরের নীচে একটা ছোট্ট কুঠুরী। সেই ঘরেই তার কল্পনার রাজ্যে যাত্রা শুরু। বাড়ির মা-কাকিমা-খুড়িমাদের মুখে শোনা গল্প তাঁর হিয়ার মাঝে রূপকথার রহস্যময় পরিবেশকে সযত্নে বপন করে দেয়। এই কারণেই পরবর্তী কালে বাংলার লোকজীবন ও লোকশিল্পের প্রতি তাঁর এত টান। শৈশবের রূপকথার জগৎ বাইরের আলোতে মুক্তবায়ুর সন্ধান পেলো রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে মৃণালিনীদেবী রূপকথা সংগ্রহ করে যে খাতা তৈরি করেছিলেন, সেখানে থেকেই অবনীন্দ্রনাথ

সংগ্রহ করেন 'ক্ষীরের পুতুল'-এর কাহিনি। 'শকুন্তলা'তেও আর্য রাজপরিবার ও তপোবনের পরিবর্তে এক শান্ত গ্রাম্য পল্লীশ্রী ফুটে উঠেছে কেবলমাত্র রূপকথার আবহে।

সংস্কৃত 'শকুন্তলা' কাহিনি 'বিলাসকলা'য় পারঙ্গম। অবনীন্দ্রনাথ সেই কাহিনিকে রাজদরবার থেকে এনে ফেললেন শিশু কিশোরের দরবারে। ফলে তার গদ্যের ভাষা এক চমৎকার মোহিনীমায়ায় আচ্ছন্ন যা রূপকথার পরিবেশ উপহার দেয়। শকুন্তলার প্রেমে উদ্বেল দুষ্মন্ত রূপকথার রাজাদের মতোই মাটির মানুষ —

> *"পৃথিবীর রাজা বনবাসীর মতো বনে বনে 'হা শকুন্তলা'! হো শকুন্তলা!" বলে ফিরছে। হাতের ধনুক, তূণের বাণ কোন বনে পড়ে আছে! রাজবেশ নদীর জলে ভেসেগেছে, সোনার অঙ্গ কালি হয়েছে, দেশের রাজা বনে ফিরছে।"*

বছর চল্লিশেক আগে বিদ্যাসাগরও বাংলায় 'শকুন্তলা' অনুবাদ করেছিলেন। সেখানে সংস্কৃতগন্ধী ভাষা ও বর্ণনারচ্ছটা শকুন্তলার কাহিনিকে বঙ্গদেশের ভূমিজ কাহিনিতে রূপান্তরিত করতে পারেনি। অবনীন্দ্রনাথ শকুন্তলার কাহিনি বর্ণনা করতে গিয়ে পেলব-মসৃণ আটপৌরে ভাষা ব্যবহার করলেন—

> *"আর শকুন্তলা কি করছে?*
>
> *নিকুঞ্জবনে পদ্মের বিছানায় বসে পদ্মপাতায় মহারাজকে মনের কথা লিখছে। রাজাকে দেখে কে জানে তার মন কেমন হল! এক দণ্ড না দেখলে প্রাণ কাঁদে, চোখের জলে বুক ভেসে যায়। দুই সখী তাকে পদ্মফুলে বাতাস করছে, গলাধরে কত আদর করছে, আঁচলে চোখ মোছাচ্ছে, আর ভাবছে - এইবার ভোর হল, বুঝি সখির রাজা ফিরে এল।*

রূপকথায় 'চিত্র' অর্থাৎ 'ছবি' ও সংগীতের মিলনে অনাস্বাদিত এক জগৎ গড়ে ওঠে। ভাষা সেক্ষেত্রে পাঠককে পৌঁছে দেয় রূপকথার জগতে। যেমন —

> *"প্রিয়ম্বদা কেশর ফুলের হার নিলে, অনসূয়া গন্ধ-ফুলের তেল নিলে, দুই সখীতে শকুন্তলাকে সাজাতে বসল। তার মাথায় তেল দিলে, খোঁপায় ফুল দিলে, কপালে সিঁদুর দিলে, পায়ে আলতা দিলে, নতুন বাকল দিলে; তবুতো মন উঠল না! সখীর এ কি বেশ করে দিলে? প্রিয়সখী শকুন্তলা পৃথিবীর রাণী তারকি এই সাজ? হাতে মৃণালের বালা, গলায় কেশরের মালা, খোঁপায় মল্লিকার ফুল, পরণে বাকল?- হায় হায়, মোতির মালা কোথায়? হীরের বালা কোথায়? সোনার মল কোথায়? পরণে শাড়ি কোথায়?"*

শব্দের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। মৃণাল, বালা, কেশরের মালা, মল্লিকা ফুল প্রভৃতি শব্দ শিশুদের আকৃষ্ট করবে। মোতিরমালা, হীরের বালা রূপকথার চেনা মোটিফ।

'শকুন্তলার' কাহিনি ছোটদের জন্য নয়। তা একান্তই বড়োদের জগতের বিষয়। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের রচনাকৌশল ও কাহিনি পরিবেশনের ঢঙ এমনই মনোরম যে, তা সহজেই ছোটদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। বড়োদের জীবন জটিলতা ছোটদের জন্য নয়, বরং, 'শিশুমনের চাহিদা অনেক সরল, কেবল রূপ সৃষ্টি করিয়া তাহার চোখ দুটিকে তৃপ্ত করিতে পারিলেই আর কিছু সে চাহে না'। [১৫] একারনেই অবনীন্দ্রনাথের গল্পে ছবির অফুরন্ত প্রাচুর্য। বর্ণনার পর বর্ণনায় তিনি মূর্ত করেন তার কাহিনিকে। তবে তা কখনই অহৈতুকী দোষে দুষ্ট নয়। বরং সংক্ষিপ্ত অথচ সংহত বর্ণনার প্রসাদগুণে তাঁর 'শকুন্তলা' ছোটদের হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছেছে।

রূপকথা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেননি তিনি। কিন্তু রূপকথার জগৎ তৈরি করতে গিয়ে বাংলার জল হাওয়ায় কাহিনিকে সম্পৃক্ত করেছিলেন, যা তাকে বিশিষ্টতা দান করেছিল। মুখ্যত রূপকথার গল্প পরিবেশনের রীতিই তাঁর আজীবনের সম্বল —

> *" বাঙলা সাহিত্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরই একমাত্র লেখক যিনি তাঁর সমগ্র গদ্য সাহিত্যকে, একটি রীতি 'তে, আবদ্ধ রেখেছিলেন। সেই রীতিই হয়েছে 'রূপকথা রীতি'; অন্যকোনো শিল্পরীতিতে কাহিনি - বর্ণনের চেষ্টা তিনি করেন নি বললেই চলে।"* [১৬]

'শকুন্তলার'র পর এই রূপকথার রীতিটি স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর 'ক্ষীরের পুতুল' (১৮৯৬) গ্রন্থে

রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় অবনীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবপদাবলীর আঙ্গিকে ছবি আঁকা শুরু করেছিলন। তাছাড়া ১৮৯০ থেকে ১৮৯৫ সালের মধ্যে দেশজ ঐতিহ্য ও রীতিতে তিনি ছবি ও অলঙ্করণের কাজ করেন। ফলে তাঁর হৃদয়ে দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি তীব্র অনুরাগ ও আকর্ষণ জন্মায়। 'শকুন্তলা'ও 'ক্ষীরের পুতুল' এই ঐতিহ্যেরসূত্রে গ্রন্থিত। রবীন্দ্রনাথ সে সময় প্রাচীন রূপকথা সংগ্রহে মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী মৃণালিনীদেবী রূপকথা সংগ্রহ করে একটি খাতায় লিখে রাখতেন। অবনীন্দ্রনাথ সেই খাতা থেকেই 'ক্ষীরের পুতুল' -এর কাহিনি সংগ্রহ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন —

> *"তিনি (রবীন্দ্রনাথ) কাকীমাকে (রথীর মা) দিয়েও অনেক রূপকথা সংগহ করিয়েছিলেন। কাকীমা সেই রূপকথা গুলি একখানি খাতায় লিখে রাখতেন, তাতে অনেক ভালো ভালো রূপকথা ছিল। তাঁর সেই খাতাখানি থেকেই আমার 'ক্ষীরের পুতুল' গল্পটি নেওয়া।"* [১৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, খগেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর 'শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য' গ্রন্থে 'ক্ষীরের পুতুলের' কাহিনিকে অবনীন্দ্রনাথের মৌলিক সৃজন বলে উল্লেখ করেছেন।[১৮] কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের উপরিউক্ত

স্বীকারোক্তিই প্রমাণ যে 'ক্ষীরের পুতুল'-এর কাহিনি মৌলিক নয়। প্রচলিত রূপকথা (লোককাহিনি) ও ষষ্ঠীব্রতর আধুনিকীরকণ ঘটেছে অবনীন্দ্রনাথের হাতে। পরবর্তীকালে দক্ষিণারঞ্জন সংকলিত 'বুদ্ধু ভূতম' নামক রূপকথার সঙ্গেও 'ক্ষীরের পুতুল' -এর আন্তরিক সাযুজ্য আছে। যা প্রমাণ করে অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল' আসলে রূপকথার 'পুনর্সৃজন'।

'ক্ষীরের পুতুল'-এর সূচনায় আছে রূপকথার আঙ্গিক, আর সমাপ্তি ঘটেছে ব্রতকথার পদ্ধতিতে। অথচ রূপকথা ও ব্রতকথার মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। তবে যেহেতু রূপকথা ও ব্রতকথা - এই দু'য়েরই উৎপত্তি ও প্রচার মেয়েদের মুখে মুখে, তাই এই দু'য়ের মধ্যে কিছু আন্তরিক সাযুজ্য আছে। অবনীন্দ্রনাথ তার লেখায় তাই বহিরঙ্গে রূপকথার আঙ্গিক নিয়ে এলেও ভাবগত দিকে থেকে ব্রতকথার মঙ্গলময় মূর্তিটিকেই উন্মোচন করতে চাইলেন। গ্রামবাংলার ষষ্ঠীব্রত[১৯] যেন রূপকথার আঙ্গিকেই পরিবেশিত হল এখানে।

'ক্ষীরের পুতুল' -এর কাঠামোতে রূপকথার চেনা গল্পটিই রয়েছে। এক রাজার দুই রাণী। সুয়োরাণী ও দুয়োরাণীর মধ্যে অবস্থানগত ফারাক বিস্তর। ছোটরাণী সুয়োরাণী রাজার প্রাসাদে সাতশ দাসীর সেবায় সুখে দিন যাপন করে। আর বড়োরাণী দুয়োরাণীর দুঃখের শেষ নেই।

> *"আর দুয়োরাণী - বড়রাণী, তাঁর বড় অনাদর, বড় অযত্ন। রাজা বিষ নয়নে দেখেন। একখানি ঘর দিয়েছেন - ভাঙাচোরা, এক দাসী দিয়েছেন - বোবাকালা। পরতে দিয়েছেন জীর্ণ শাড়ি, শুতে দিয়েছেন - ছেঁড়াকাঁথা। দুয়োরাণীর ঘরে রাজা একটি দিন আসেন, একবার বসেন, একটি কথা কয়ে উঠে যান।"*

এরপর বড় রাণীর দুঃখ ঘোঁচে রূপকথার স্টাইলেই। রূপকথার চেনা ছক অনুযায়ী রাজা চললেন দেশভ্রমণে। ছোটরাণী মূল্যবান মণিমাণিক্য নিয়ে আসার ফরমান দিলেও মনের দুঃখে বড়রাণী চেয়ে বসলেন এক মুখপোড়া বাঁদর। ঘটনাচক্রে এই বাঁদরই দুয়োরাণীর সুখ সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনল।

রাজা ছিলেন অপুত্রক। তিনি যে বাঁদরটি এনে দিয়েছিলেন বড়রাণীকে, সে এসে খবর দিল, যে বড়রাণী সন্তান-সম্ভবা। রাজা ছোটরাণীকে যখন সংবাদ দিলেন, সে হিংসায় জ্বলে পুড়ে গেল। বললো—"আর পারিনে। কার ছেলে রাজা হবে, কার মেয়ে রাজ্য পাবে, কে রাজসিংহাসনে বসবে, এত ভাবনা ভাবতে পারিনে।" বড়রাণীকে পুত্রসুখ থেকে বঞ্চিত করার জন্য ছোটরাণী তার ডাকিনী ব্রাহ্মণীর সহায়তায় বড়রাণীকে বিষ খাওয়ালেন। বানর তাঁকে বাঁচালেন। রাজা বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হয়ে বন্দী করলেন ছোটরাণীকে।

রূপকথার এই কাঠামোটিতে এরপর প্রবেশ করেছে লৌকিক ব্রতকথার পরিবেশ। বানর রাজাকে বড়রাণীর যে পুত্রের কথা বলেছিলেন বাস্তবে তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। বানর শর্ত দিয়ে ছিল জন্মের পরবর্তী দশবছর রাজা পুত্রের মুখ দর্শন করতে পারবেন না। দশবছর পরে

বানরের কথায় রাজা পাটলী দেশের রাজার মেয়ের সঙ্গে তার পুত্রের বিবাহ দিতে চললেন। রাজা চলেছেন আগে আগে। পিছনে পালকির ভেতর ক্ষীরের ছেলেকে বর সাজিয়ে চলেছে বানর। পথে পড়ল দিগ্‌নগরের ষষ্ঠীতলা। বানরের চালাকিতে সেদিন সকালবেলা গ্রামের লোকেরা পুজো দিতে পারল না ষষ্ঠীঠাকুরণের। ফলে অভুক্ত ষষ্ঠীঠাকুরণ উপায়ন্তর না দেখে মনস্থির করলেন বরবেশী ঐ ক্ষীরের পুতুল খাওয়ার। তাই —

> *"ষষ্ঠী ঠাকুরণের কথায় মাসিপিসি মায়া করলেন, দেশের লোক ঘুমিয়ে পড়ল। মাঠের মাঝে রাখাল, ঘরের মাঝে খোকা, খোকার পাশে খোকার মা, খেলা ঘরে খোকার দিদি ঘুমিয়ে পড়ল। ষষ্ঠীতলায় রাজার লোকজন, পাঠশালায় গাঁয়ের ছেলেপিলে ঘুমিয়ে পড়ল। রাজার মন্ত্রী হুঁকোর নল মুখে ঘুমিয়ে পড়লেন, গায়ের গুরু বেত হাতে ঢুলে পড়লেন। দিগ্‌নগরে দিনে দুপুরে রাত এল।"*

সুযোগ বুঝে তাঁর এককাঁড়ি বেড়ালদের নিয়ে ষষ্ঠীঠাকুরণ ঐ ক্ষীরের পুতুলটি ভক্ষণ করলেন। তিনি বুঝতেও পারেননি যে, তিনি আসলে তার জন্য বিছানো বানরের ফাঁদে পড়েছেন। ষষ্ঠী ঠাকুরণের খাওয়া শেষ হওয়ামাত্র - "বানর গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে বললো - ঠাকরুণ, পালাও কোথা আগে ক্ষীরের ছেলে দিয়ে যাও। চুরি করে ক্ষীর খাওয়া ধরা পড়েছে, দেশ বিদেশে কলঙ্ক রটাব।" শেষ পর্যন্ত লোকলজ্জার ভয়ে একপ্রকার মুক্তিপণ হিসাবেই বানরের হাতে একটি ফুটফুটে ছোট খোকা এল। ষষ্ঠীর কৃপায় বড় রাণীকে নিয়ে রাজামশাই সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

রূপকথার এই চেনাগল্পে ব্রত কথার আমেজ এসেছে ঐ ষষ্ঠীঠাকুরণের হাত ধরেই। গ্রামবাংলার লৌকিক বিশ্বাসে দেবীষষ্ঠীই সন্তানদাত্রী ও সন্তানের সুখ প্রদাণকারী। তাই ষষ্ঠী ঠাকরুণ বানরকে বলেন, 'ওই বটতলায় আমার ছেলেরা খেলা করছে তোর যেটিকে পছন্দ সেটিকে নিয়ে বিয়ে দিগে যা।' শেষে দেবীষষ্ঠীর কৃপায় রাজার মনস্কামনা পূরণে যে মধুরেন সমাপয়েৎ ঘটেছে কাহিনির, সেখানে প্রচ্ছন্ন আছে ব্রত কথার শুভঙ্করী দিকটি। কেননা অবনীন্দ্রনাথের মত অনুসারে এই ব্রতকথাগুলিই মানুষের কামনার প্রতিচ্ছবি, কামনার প্রতিক্রিয়া ও কামনার প্রতিধ্বনি। ক্ষীরের পুতুলের সত্যিকারের খোকা হয়ে ওঠার কাহিনি তাই এক ধরণের ইচ্ছাপূরণেরও গল্প। যার মধ্যে নিহীত রয়েছে বাবা-মায়ের সুস্থ সবল সন্তান লাভের সুপ্ত কামনা। সে অর্থে ক্ষীরের পুতুলের সমাপ্তি তাই ব্রতকথার রীতিঅনুসারী।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'ক্ষীরের পুতুল'কে আদ্যন্ত ব্রতকথা হয়ে উঠতে দেননি স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ। তাঁর অনবদ্য বর্ণনাগুণ এবং আটপৌরে ভাষা এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কাহিনি বর্ণনার জন্য তিনি এমন এক ভাষা তৈরী করেন, যা আদ্যন্ত রূপকথার পরিবেশ সৃষ্টি করে। এক ধরণের সহজ সারল্যে ভরপুর থাকে রূপকথার ভাষা। চরিত্র অনুযায়ী মাটির কাছাকাছি নেমে আসে তা।

দুয়োরাণীর অভিমান গুমরে গুমরে প্রকাশ পায় যেমন এখানে,তেমনি হিংসুটেরাণীর ঈর্ষাপরায়ণ মন, রাজার আন্তরিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পাশাপাশি ষষ্ঠীঠাকরুণের লজ্জাবনত রূপটিও প্রকাশ পায় এখানে। এমনকী রূপকথাধর্মী ট্রিপিকাল বর্ণনাও এখানে সুপ্রচুর —

"রাজা স্ফটিকের সিংহাসনে রাণীর পাশে বসে বললেন —
এই নাও রাণী। মানিকের দেশে মানিকের ঘাট, সেখান থেকে
হাতের চুড়ি এনেছি। সোনার দেশে সোনার ধুলো,
সোনার বালি - সেখান থেকে পায়ের মল এনেছি।
মুক্তোর রাজ্যে মুক্তোর পা, মানিকের ঠোঁট, দুটি পাখি
মানিকের ডিম পাড়ে। দেশের রাণী সেই মুক্তোর হার
গাঁথেন, রাতের বেলায় খোঁপায় পরেন, ভোরের
বেলায় ফেলে দেন। রাণী, তোমার জন্য সেই মুক্তোর হার এনেছি।"

রূপকথার প্রয়োজনেই তিনি লৌকিক বাক্‌রীতির আশ্রয় নিয়েছেন। ষষ্ঠী ঠাকরুণের বরে দিব্যদৃষ্টি লাভ করে বানর যে দিব্যস্বপ্ন দেখে, সেখানেও সেই লৌকিক বাক্‌রীতিই প্রাধান্য পেয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লোকজীবনের থেকে আহরণ করে আনা বিভিন্ন ছড়া ও কিংবদন্তীর অনুষঙ্গ। বানরের দিব্যস্বপ্ন বর্ণনার ছত্রিশটি বাক্যে তিনি ১৭টি বাংলা ছড়া ও গানের রূপকল্প ব্যবহার করেছেন। একটু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"সেখানে আছে দীঘির কালোজল তার ধারে সর বন, তেপান্তরের মাঠ তারপরে
আম কাঁঠালের বাগান, গাছে গাছে ন্যাজঝোলা টিয়াপাখি, নদীর জলে
গোলচোখ বোয়ালমাছ, কচু বনে মশার ঝাঁক। আর আছে বনের ধারে
বনগাঁবাসী মাসি-পিসি, তিনি খইয়ের মোয়া গড়েন, ঘরের ধারের ডালিম
গাছটি তাতে প্রভু নাচেন।

ব্যবহৃত লৌকিক ছড়াগুলি হলো —

(ক) 'আয়রে পাখি লেজঝোলা
তোকে দেব দুধকলা'

(খ) 'না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে
তা না দেখে ভোঁদড় নাচে।
মশার জ্বালায় বাঁচিনে
মশা ভন্‌ভন্ করে।'

(গ) 'মাসিপিসি বনগাঁবাসী

বনের ভেতর ঘর
কখনো মাসি বলে না তো
খই মোয়াটা ধর।

(ঘ) 'ডালিম গাছে পরভু নাচে।
তাক ধুমাধুম বাদ্যি বাজে।'

এছাড়াও এই দিব্যস্বপ্নে তিনি প্রসঙ্গক্রমে আরও সুপ্রচলিত কয়েকটি ছড়া ব্যবহার করেছেন। যেমন —

(ঙ) 'আগ্‌ডুমবাগডুম ঘোড়াডুম সাজে',
(চ) 'খোকা যাবে মাছ ধরতে ক্ষীর-নদীর কুলে
ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে মাছ নিয়ে গেল চিলে'।

(ছ) 'পুঁটু যাবে শ্বশুর বাড়ি সঙ্গে যবে কে।
ঘরে আছে কুনো বেড়াল কোমর বেঁধেছে।'

এসেছে সেই বিখ্যাত শিবঠাকুরের ছড়া —

'শিবঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান।
এক কন্যা রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান
এককন্যা গোসা করে বাপের বাড়ি যান।'

এইভাবে লৌকিক ছড়া ও কথকতা, গ্রামজীবনের নিবিড় পল্লিশ্রীর মায়া-মোড়কে পরিবেশন করে অবনীন্দ্রনাথ তার রূপকথাধর্মী লেখনীকে স্বকীয়তা দান করেছেন। শুধু তাঁর রূপকথাধর্মী লেখাতেই নয়, পরবর্তীকালে তিনি ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে যে গ্রন্থগুলি রচনা করলেন, সেখানেও এই পরিবেশ শিকড় বিস্তার করেছে।

(৩)

অবনীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থটি হল 'রাজকাহিনি'। এটি দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমখণ্ডের প্রকাশকাল ১৯০৯, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে। টডের 'অ্যানালস অ্যাণ্ড এ্যান্টিকুইটস অব রাজস্থান' গ্রন্থটির কাহিনিসূত্র অবলম্বন করে রচিত 'রাজকাহিনি' মূলত রাজপুতনার ইতিহাস। তবে এ ইতিহাস সন তারিখ ও তথ্যের হুবহু অনুসরণ নয়। বরং ঐতিহাসিক ঘটনা ও লোকশ্রুতির অন্দরমহল থেকে নির্বাচন করে তিনি ইতিহাসের গল্প শোনালেন। ইতিপূর্বেও বাংলা গল্পে ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। তবে অবনীন্দ্রনাথই প্রথম নিখাদগল্পের বিষয়বস্তু করে ছোটদের জন্য রাজপুতনার কাহিনি পরিবেশনে উদ্যোগী হলেন। এর পিছনে তাঁর 'স্বদেশচর্চা'র আগ্রহ সক্রিয় ছিল।

'রাজকাহিনি'র প্রথম খণ্ড প্রকাশের সময়কাল বঙ্গদেশের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কার্জনের বঙ্গবিভাগকে কেন্দ্র করে স্বদেশি আন্দোলনে উত্তাল হয়েছিল বাংলা। ঠাকুরবাড়ির রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথও সেখানে সামিল হলেন। ইতিপূর্বে অবনীন্দ্রনাথ শিল্পচর্চারসূত্রে দেশীয় ঐতিহ্য ও দেশীয় বিষয়কে গ্রহণ করেছিলেন মনেপ্রাণে। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে সেই দেশীয় ঐতিহ্যবোধ আরও প্রবল হলো। ফলে 'ক্ষীরের পুতুল' লেখার পর দীর্ঘদিন বাদে তিনি বাংলার তরুণ ছেলে-মেয়েদের সামনে ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তুলে ধরার তাগিদ অনুভব করেন। এক্ষেত্রে তিনি বেছে নিলেন বীরের জাতি রাজপুতনার লোককাহিনিকে। পূর্বেই বলা হয়েছে, 'রাজকাহিনি' ইতিহাস নয়। ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে জমে থাকা লোকশ্রুতির চূর্ণ। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই 'রাজরাজড়ার কাহিনিকে ঘিরে জমে উঠেছে ঈর্ষা, স্বার্থ, স্বার্থত্যাগ, নিষ্ঠুরতা, জয়ের উল্লাস আর মৃত্যুর ভয়াবহতা।'

তবে বহুরাজ্য ও বিস্তৃত রাজবংশগুলির সামগ্রিক কাহিনি লেখেননি তিনি। 'রাজকাহিনি'র উপজীব্যরূপে তিনি বেঁছে নিয়েছেন 'মেবার' রাজবংশের নির্বাচিত কয়েকজনকে। দুখণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থে মোট ৯টি কাহিনি স্থান পেয়েছে। এগুলি হল-শিলাদিত্য, গোহ, বাপ্পাদিত্য, পদ্মিনী, হাম্বির, হাম্বিরের রাজ্যলাভ, চণ্ড, রানাকুম্ভ ও সংগ্রাম সিংহ। টডের সংকলিত কাহিনির হুবহু অনুসরণের পরিবর্তে নিজের কল্পনার রঙে চিত্রিত করেছেন তাদের। 'ইতিহাস যেখানে অনেক বেশী নীরব, সেখানে তাঁর কল্পনাশক্তিও অনেক বেশী সক্রিয়। কিন্তু পড়তে পড়তে মনে হবে, এ কল্পনা নয়, শিল্পীর দৃষ্টি যেন যুগান্তরের অন্ধকার ভেদ করে যেমনটি ঠিক হতে পারত, তাকেই দেখতে পেয়েছে।'[২০]

'রাজকাহিনি'র' প্রথম গল্পের নায়ক শিলাদিত্য। ইতিহাসে শিলাদিত্য কিংবা তাঁর রাজধানী বল্লভীপুর সম্পর্কে তেমন প্রামাণ্য ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। টড তাঁর গ্রন্থে শিলাদিত্যের যে পরিচয় দিয়েছেন, সেই কাল্পনিক কাহিনিকে আশ্রয় করে অবনীন্দ্রনাথ তাকে পরিবর্তিত করে শিলাদিত্যের রোমান্সধর্মী কাহিনি উপহার দিয়েছেন। বল্লভীপুরের পটভূমিতে শিলাদিত্যের জয়, মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় তার মৃত্যু ও বল্লভীপুরের ধ্বংস্তূপে পরিণত হওয়ার কাহিনি এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। এক্ষেত্রে ইতিহাস পরিণত হয়েছে লোকশ্রুতিতে। যেমন কাহিনির সমাপ্তিতে রয়েছে —

> *"শিলাদিত্য সেই সূর্যকুণ্ডের তীরে সূর্যের উপাসনা করতেন; তখনি তাঁর জন্য সপ্তাশ্বরথ জল থেকে উঠে আসত। শিলাদিত্য সেই রথে যখন যে যুদ্ধে গিয়েছেন, সেই যুদ্ধেই তাঁর জয় হয়েছে। ... সিন্ধুপারে শ্যামনগর থেকে পারদ নামে অসভ্য একদল যবন যখন বল্লভীপুর আক্রমণ করলে তখন সেই বিশ্বাসঘাতক, তুচ্ছ পয়সার লোভে সেই অসভ্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে, গো-রক্তে সেই পবিত্র কুণ্ড অপবিত্র করলে। শিলাদিত্য যুদ্ধের দিন যখন সেই কুণ্ডের তীরে সূর্যের উপাসনা করতে লাগলেন, তখন আগেকার মতো নীল জল ভেদ করে দেবরথ উঠে এল না ..... সেই যুদ্ধেই তাঁর প্রাণ গেল। ....*

বিধর্মী শত্রু সোনার মন্দির চূর্ণ করে বল্লভীপুর ছারখার করে চলে গেল।"

'রাজকাহিনি'র দ্বিতীয় গল্প 'গোই' বা গোহলকে নিয়ে। গোহ মেবারের প্রতিষ্ঠাতা। শিলাদিত্যের পুত্র গোহ শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন। শিলাদিত্য নিহত হওয়ার সময় রাণী পুষ্পবতী শিলাদিত্যেরই নির্দেশে গর্ভস্থ গোহর জন্য পুজো দিতে ভবানীর মন্দিরে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে, "চন্দ্রাবতীর রাজকন্যা গর্ভবতী রাণী পুষ্পবতীকে সেই চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদে বাপমায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মনে বড় ইচ্ছা ছিল যে, যুদ্ধের পর শীতকালটা বিন্ধ্যচলের শিখরে নির্জনে সেই শ্বেত পাথরের প্রাসাদে রাণী পুষ্পবতীকে নিয়ে আরামে কাটাবেন; তারপর রাণীর ছেলে হলে দুজনে একসঙ্গে রাজপুত্রকে কোলে নিয়ে বল্লভীপুরে ফিরবেন।" কিন্তু এই ইচ্ছে অপূর্ণ রেখেই মৃত্যু হল শিলাদিত্যের। পুষ্পবতী একটি সন্তানের জন্ম দিয়ে বীরনগরের ব্রাহ্মণী কমলাবতীকে দিলেন সেই পুত্র সন্তানকে প্রতিপালন করার জন্য। তারপর স্বামীকে স্মরণ করে আশ্রয় নিলেন অগ্নিশয্যায়। এই শিশুপুত্রই গোহ।

গোহ ক্রমে ক্রমে শৌর্যে-বীর্যে অপ্রতিহত হয়ে পাহাড়ি ভীলদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। ভীলপ্রধান মাণ্ডলিকের প্রচ্ছন্ন সহায়তায় ভীলরা গোহকে তাদের রাজা নির্বাচিত করল। টড তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, পরে গোহ অকৃতজ্ঞের মতো তার এই উপকারী বন্ধু মাণ্ডলিককে হত্যা করেছে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ গোহর এই কলঙ্ক ভঞ্জন করেছেন। তাঁর কাহিনিতে গোহ মাণ্ডলিকের হত্যাকারী নয়। পাহাড়ের উপর থেকে পড়ে গিয়ে গোহের নামাঙ্কিত ছুরি বিঁধে গিয়ে মাণ্ডলিকের মৃত্যু হয়েছে।

'বাপ্পাদিত্য'র কাহিনি ইতিহাস ও লোকশ্রুতির আলো-আঁধারী জগতের। গোহর তিনপুরুষ পর মেবারের রাজা হন নাগাদিত্য। পাহাড়ি উপজাতি ভীলদের উপর তাঁর অমানুষিক অত্যাচারের পরিণামে ভীলদের হাতে মৃত্যু হয় নাগাদিত্যের। তার তিনবছরের পুত্র বাপ্পাদিত্যকে পুরোহিত ব্রাহ্মণ নিয়ে গেলেন পরাশরের অরণ্যে। সেখানে ত্রিকূট পাহাড়ের নগেন্দ্রনগরে ছেলেবেলা অতিবাহিত করেছে বাপ্পাদিত্য। বাপ্পা গোরু চড়াত। একদিন খেলাচ্ছলেই তার সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় শোলাঙ্কি রাজকুমারীর। ঝুলনের দিন শোলাঙ্কির রাজকুমারী বনে এসেছিল সখীদের নিয়ে। দোলনাবাঁধার জন্য বাপ্পার কাছে দড়ি চাইলে, বাপ্পার শর্ত মেনে একটি গাছকে সাক্ষী রেখে বিয়ে হয় তাদের। —

> *"সেইদিন সেই নির্জন বনে, রাজকুমারীর হাতে সেই হীরের বালা পরিয়ে দিয়ে রাজকুমার বাপ্পা চাঁপাগাছে ঝুলনা বেঁধে নিয়ে রাজকন্যার হাত ধরে বসলেন। চারিদিকে যত সখী দোলনার উপর বর কনেকে ঘিরে ঘিরে ঝুলনের গান গেয়ে ফিরতে লাগল — আজ কি আনন্দ! আজ কি আনন্দ!"*

তাদের বিয়ের কথা প্রকাশিত হবার পর শোলাঙ্কিরাজের ভয়ে বাপ্পা তার সঙ্গি দুই ভীল বালক বালিয় ও দেবকে নিয়ে নগেন্দ্রনগর ত্যাগ করে।

বাপ্পাদিত্যের কাহিনিতে আলৌকিক উপাদান প্রচুর পরিমানে বিদ্যমান। মুণি হারীতের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ, ভগবতী ভবানীর খাঁড়া ও অক্ষয় ধনুঃশর প্রাপ্তি লৌকিকতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। হারীতের কৃপায় অজেয় শক্তিশালী বাপ্পা চিতোরে উপস্থিত হন। সেখানে মোরীরাজ তাকে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু একদিন সমস্ত কৃতজ্ঞতা ভুলে সামন্তরাজাদের সঙ্গে, ষড়যন্ত্র করে যুদ্ধে মোরীরাজকে পরাজিত করে সিংহাসন দখল করে সে। ক্রমে ক্রমে জয় করে বহুরাজ্য। কিন্তু শেষদিন পর্যন্ত তার মনে চির উজ্জ্বল হয়েছিল শোলাঙ্কির সেই রাজকুমারীর স্মৃতি।

এক বিষাদময় বীরত্বের কাহিনি 'পদ্মিনী'। স্বর্গীয়রূপে গরিয়সী সিংহলী রাজকন্যা পদ্মাবতীর রূপের বর্ণনায় মুগ্ধ আলাউদ্দীনের তুমুল ইচ্ছা তাকে পাওয়ার। চিতোরের রাজবধূকে লাভ করার তীব্র আকাঙ্খায় তিনি চিতোর অবরোধ করলেন। ভীম সিংহকে পরাস্ত করতে না পেরে আলাউদ্দীন অনুরোধ জানালেন, আয়নার মধ্য দিয়ে পদ্মাবতীকে দেখবার। রানা রাজী হলেন। কিন্তু আয়নায় রাণীর অপরূপ প্রতিচ্ছবি দেখে স্থির থাকতে পারলেন না সুলতান। তিনি ছুটে গেলেন আয়নার দিকে —

> *"রাগে রানার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, তিনি সেই ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঠে সোনার একটা পেয়ালা সেই আয়নাখানার ঠিক মাঝখানে সজোরে ছুঁড়ে মারলেন - ঝনঝন শব্দে সাতহাত উঁচু চমৎকার সেই আয়না চুরমার হয়ে ভেঙ্গে পড়ল।"*

ক্রুদ্ধ সুলতানের নির্দেশে ভীমসিংহ বন্দী হলেও রাণী পদ্মাবতীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে ভীমসিংহ রক্ষা পেলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল না, মেবার রাজ্যের কুলবধূর সম্ভ্রম রক্ষা করতে শেষপর্যন্ত একে একে প্রাণ বিসর্জন দিলেন মেবারের সমস্তবীর, কুলবধূ এমনকি স্বয়ং পদ্মিনীও। আত্মসমপর্ণের পরিবর্তে ভারতীয় সাধ্বী রমনীর সতীত্ব রক্ষার জন্য জহরব্রতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন পদ্মিনী —

> *"বারো হাজার রাজপুতের মেয়ে সেই অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে গাইতে লাগল, 'লাজহরণ! তাপবরণ!' হঠাৎ একসময় মহাকল্লোলে চারিদিক পরিপূর্ণ করে হাজার হাজার আগুনের শিখা মহা আনন্দে সেই সুড়ঙ্গের মুখে ছুটে এল। প্রচণ্ড আলোয় রাত্রির অন্ধকার টলমল করে উঠল। বারো হাজার রাজপুতনীর সঙ্গে রাণী পদ্মিনী অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন — চিতোরের সমস্ত ঘরের সমস্ত সোনামুখ, মিষ্টি কথা আর মধুর হাসি নিয়ে এক নিমেষে চিতোর আগুনে ছাই হয়ে গেল!"*

হাম্বিরের কাহিনি নিয়ে লেখা দুটি গল্প হলো 'হাম্বির'ও 'হাম্বিরের রাজ্যলাভ'। 'হাম্বিরের রাজ্যলাভ' গল্পে বীরবালক হাম্বির শ্মশানে ভূতপ্রেতের আড্ডা থেকে উদ্ধার করে আনে মা ভবানীর খাঁড়া। তারপর সে দখল করে চিতোর। শেষপর্যন্ত রাজকন্যাকে বিয়ে করে সংসারী হয় সে।

'রাজকাহিনি'র সর্বশেষ কাহিনি 'সংগ্রামসিংহ'। রানা কুম্ভের মৃত্যু ও তার পুত্র রায়মল্লর সিংহাসনপ্রাপ্তি এই গল্পের মূল বিষয়। বৃদ্ধরাণা কুম্ভ হঠাৎই রেগে গিয়ে যুবরাজ রায়মল্লকে তাড়িয়ে দিলেন রাজ্য থেকে। সেই সুযোগে কুম্ভের মেজোছেলে ঘাতিরাও বিষ খাইয়ে হত্যা করে কুম্ভকে। মেবারের সর্দারেরা এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ঠিক করলো রায়মল্লকে যেমন করে হোক খুঁজে এনে বসানো হবে সিংহাসনে। শঙ্কিত ঘাতিরাও স্মরণ নিলেও দিল্লী বাদশা বহলোললোদীর। কিন্তু পথে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল ঘাতিরাও এর। বাদশা চিতোর দখল করতে এসে পড়ল বাঘের মতো রাজপুত সেনার সামনে —

> *"সুলতান বহলোল চিতোরের রাজকুমারীকে বিয়ে করতে এসে দেখলেন বাহান্ন হাজার সওয়ার আগে, এগারো হাজার পাইক সঙ্গে, রায় বাঘের মতো রায়মল তাঁকে ধরবার জন্যে পাহাড়ের উপর বসে আছেন। পাঠান সুলতান বিয়ে করতে এসেছিলেন বর সেজে, কিংখাবের লুঙ্গি কোমরে জড়িয়ে, জরির লপেটা ফেলে চম্পট দিলেন যেখান থেকে এসেছিলে সেই দিল্লীতে।"*

রায়মল্ল বসলেন চিতোরের সিংহাসনে। তিনি বৃদ্ধ হলে তার উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ বাধলো তার তিন পুত্র - সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ ও জয়মলের মধ্যে। লড়াইয়ে জখম হয়ে সঙ্গ রাজ্য ছেড়ে পালাল। ফেরার জয়মল আশ্রয় পেল টোডার রাজের কাছে। কিন্তু সে টোডার রাজকে হত্যা করলে রাজকন্যা তারাবাঈয়ের হাতে নিহত হল। পৃথ্বীরাজকে রায়মল্ল প্রথমে নির্বাসন দিলেও শেষ পর্যন্ত সেই হলো চিতোরের অধিশ্বর।

'শিলাদিত্য', 'গোহ' 'বাপ্পাদিত্য', ও 'হাম্বির' গল্পের নায়কদের মধ্যে মিল লক্ষ্য করা যায়। শিলাদিত্য দেবতার বরপুত্র। শৈশবেই মারা যায় তার মা সুভগা। শিলাদিত্যের ছেলে গোহ, তার জন্মের আগেই শিলাদিত্য নিহত হয় বিদেশী পারদ জাতির আক্রমণে। জন্মের পর মা পুষ্পবতী মারা যায় স্বামীর অনুসরণে। বাপ্পার পিতাও তার জন্মের আগে ভীলেদের হাতে প্রাণ দেয়, মা মারা যায় তার জন্মের একটু পরেই। হাম্বিরের মা ছিল কিন্তু বাবা অরি সিং-এর মৃত্যু হয় আলাউদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধে। তাই চারজনই জন্ম মুর্হূর্তে বা অতি শৈশবে হারিয়েছে বাবা-মাকে। নিক্ষেপিত হয়েছে ভাগ্য-বিড়ম্বিত কষ্টের জীবনে। চারটি গল্পের আবহ নির্মাণেও মিল প্রচুর। গভীর পরাশর বনে গরু চরায় বালক বাপ্পা, যেখানে মহর্ষি হারীতকে সে তার কামধেনুর দুধ খাইয়ে পায় পর্বতবিদারী মা ভবানীর খাঁড়া আর অপরাজেয় ধনুঃশর অথবা যেখানে ঘনঘোর বন পার হয়ে কিশোর হাম্বির পৌঁছায় দুর্ধর্ষ ডাকাত মুঞ্জের আস্তানায়। আশ্চর্য বুদ্ধিতে নিয়ে আসে মঞ্জুর কাটা মুণ্ড— সেই জগৎও আমাদের ইতিহাসের চেনা চৌহদ্দি থেকে দূরে বহুদূরে অসম্ভব আর অলৌকিকে মিলেমেশে তৈরি এক অদ্ভুত জগৎ। রূপকথার এই জগতকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না।

ইতিহাসের বাপ্পাদিত্য যেন রূপকথার রাজপুত্রের মতই এক মায়াময় পরিবেশে তার

রাজকন্যার দেখা পান ঃ

> *"সেই বৃন্দাবনের মত গহন বন, সেই বাদলা দিনের গুরুগর্জন, সেই দূর বনে রাখাল রাজের মধুর বাঁশী, সেই সখীদের মাঝে শ্রীরাধার সমান রূপবতী রাজনন্দিনী, সবই আজ যুগ-যুগান্তরের আগেকার বৃন্দাবনের কৃষ্ণ-রাধার প্রথম ঝুলনের মতো।"*

এই রূপকথার পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলেই ইতিহাসাশ্রিত হলেও তাঁর 'রাজকাহিনি ঐতিহাসিক কাহিনি নয়। ইতিহাসের ঘটনাকে তিনি ব্যবহার করেছেন শিশুপাঠ্য কাহিনির অবয়ব নির্মাণে। কিন্তু সেখানে ইতিহাসের পরিবর্তে প্রধান হয়ে ওঠে রূপকথা। ফলে শিশুমনের ক্যানভাসে কাল্পনিক ইতিহাসের আবির্ভাব ঘটে। সম্ভ্রমের সীমানা ভেঙে তৈরি হওয়া মন উদাস করা ধূধূ প্রান্তর,ঘন পাতায় আঁধার করা নিরিড় বনস্থলী অথবা সূর্যের রেণু মাখা সবুজ জনার ক্ষেতের অন্তহীন পটে আর্বিভূত হয় চিরকালের বীরেরা। তাদের আন্দোলিত অসির বিদ্যুৎরেখায়, অশ্বখুরের ধারালো সংগীতে রচিত হতে থাকে এক কল্পনা-সম্ভব চিত্রনাট্য। 'রাজকাহিনি'র গল্পে এক রাজার পর আরেক রাজা আসে, তারপর আরেকজন। তাদের শক্তি ও সাহসে মিশে থাকে লোভ, হিংসা আর চটুল কপটতা। এখানে সিংহাসনের জন্য ছেলে বাপকে, ভাই ভাইকে খুন করে; বিপদের বন্ধুকে মেরে ফেলতে পিছ্পা হয়না মানুষ; মেয়েদের সর্বনাশ করতে হাত কাঁপেনা একটুও। শয়তানের অট্টহাসিতে অন্তরের শুদ্ধমনটি কেঁপে ওঠে।

এসব সত্ত্বেও 'রাজকাহিনি' পাঠকের চিত্তহরণ করেছে, তার কারণ এর ভাষা ও বর্ণনা। ছবির মতো ঝক্ঝকে ভাষা আর নিসর্গময় বর্ণনা 'রাজকাহিনি'কে অমর করেছে। তাছাড়া অবনীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে কুৎসিৎ বিভৎসতার বা বিশ্বাসঘাতকতার মালিন্য থেকে শিশু-কিশোরদের মুক্ত করতে চেয়েছিলেন বলেই তা প্রকট হয়নি। ইতিহাসকে ছোটদের কাছে পৌঁছেদেবার জন্যই তাই 'রাজকাহিনি' রাজ-রাজরাদের গল্পকাহিনিতে পর্যবসিত হয়েছে কল্পনার বিস্ময় মাখানো পথে।

(৪)

বিদেশী সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন চারটি বই। এগুলি হলো 'আলোরফুলকি' (ভারতী, ১৩২৬), 'খাতাঞ্চির খাতা' (সন্দেশ, ১৩২৭), 'বুড়োআংলা' (মৌচাক, ১৩২৭-২৮), 'হানাবাড়ির কারখানা' (১৯৬৩)। অবনীন্দ্রনাথের বহুপূর্বেই বাংলা সাহিত্যে বিদেশি কাহিনির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কিন্তু বড়োদের গোলার্ধ থেকে তা শিশুমনোজগতে সার্থকভাবে সঞ্চারিত হতে পারেনি। ছোটদের জন্য যে অনুবাদ হয়েছে, সেখানে বয়স্ক লেখকের মননই প্রাধান্য পেয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদে আশ্চর্যভাবে ছোটদের জগতের বিস্ময় মাখানো সারল্য ও কল্পনার রঙ ছড়িয়ে দিলেন। বিদেশি কাহিনি হলেও তিনি দেশীয় পরিচিত জগতে স্থাপন করলেন তাকে। এমনকী বিদেশি নামকরণের পরিবর্তে চরিত্রদের দেশীয় পরিচিতি দিলেন। বুড়ো আংলা, সোনালী, পাশিয়া,

পুতু, কুঁকড়ো, স্বপনপাখি, সোনাতন প্রভৃতি নামগুলো গ্রামবাংলার চেনা মানুষ হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে পুরানো কলকাতা। উঠে আসে লেজ-ঝোলা পাখি, চালতা-তলা, ঝিঁঝির ডাক। তাই বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে যতই তিনি ছড়িয়ে যান দিক্ থেকে দিগন্তে - 'দেশীয় বাতাবরণটিকে তুলে আনেন দেশের ভূগোল পরিক্রমা করে আর দেশের ঐতিহ্যকে স্মরণ করে।' [২১]

'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ মাসে মোট পাঁচটি কিস্তিতে প্রকাশিত হয় 'আলোর ফুল্‌কি'। এটি ফ্লোরেন্স ইয়েট্‌স হান -এর 'The Story of Charti-cleer' নামক গ্রন্থের অনুবাদ। অবশ্য ফ্লোরেন্স তাঁর বইয়ের কাহিনি সংগ্রহ করেছিলেন ফ্রান্সের এডমন্ড ইউজিন রোস্টাণ্ড এর 'Chanticler' নামক একটি রূপক কাব্যনাট্য থেকে। অবনীন্দ্রনাথ ফ্লোরেন্সের কাহিনিটিকে প্রায় অবিকৃতভাবেই অনুবাদ করেন 'আলোর ফুলকি'তে। এই কাহিনির পাত্রপাত্রী মোরগ - মুরগি, চড়ুই, টিয়া, পেঁচা, কুকুর প্রভৃতি পাখি ও জীবজন্তু। লোককাহিনির আদলে এরা প্রত্যেকেই মানুষের মতো কথা বলে, মানবীকগুণে সমুন্নত। গল্পের নায়ক কুঁকড়ে ও নায়িকা বনটিয়া শিল্প ও সৌন্দর্যের প্রতীক। ক্ষুদ্র সংকীর্ণ জীবন থেকে মহৎ ও বৃহত্তর জগতে উত্তরণের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে এখানে।

পাহাড়তলির আবাদের পশ্চিমে এক গোলাবাড়িতে হরেকরকম জীবজন্তুদের পাহারার কাজে নিযুক্ত রয়েছে 'মোরগফুল-মাথায়-গোঁজা কুকড়ো'। অসাধারণ নৈপুণ্যে সে আগলে রাখে তার সঙ্গি-সাথিদের। আর নিকষ কালো অন্ধকার রাতের শেষে তার কণ্ঠে জেগে ওঠে এক অপূর্ব আলোর গান-সেই গান ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত উপত্যকায়, পূব আকাশে ঘুম ভাঙে সূর্যের, আলোর পবিত্র স্পর্শে জেগে ওঠে জীবন। এইগান কুকড়োর প্রাণ। কেননা প্রকৃতি ও পৃথিবীর সমস্ত কান্না তার বুকে জমা হয়ে রূপ নেয় গানের। সেই গানে সমস্ত উপত্যকায় দিনের আলো ছড়িয়ে পড়ে। এই গান তার কাছে শিল্পীসত্তার প্রতীক। এই শিল্পের অপমানে সে প্রয়োজনে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। মৃত্যু আসন্ন জেনেও বুকচিতিয়ে দাঁড়ায় বাজখাই পালোয়ানের সামনে। তাকে পরাজিত, মৃত্যুমুখে পতিত হতে দেখতে গোলাবাড়ির অধিকাংশ পশু-পাখী যখন উদগ্রীব,বাজখাই মোরগের সামনে তখনও অকুতোভয় কুকড়ো লড়াই চালিয়েছে তার অদম্য পৌরুষ আর সাহসে বলীয়ান হয়ে। শেষ পর্যন্ত জেতে সে লড়াইতে। কিন্তু অভিমানে ঘৃণায় সে সোনালীপাখিকে নিয়ে চলে যায় বনে। সেখানে মনের আনন্দে সে গান গায়। কিন্তু সোনালী পাখি তাকে মানা করেছে আলোর গান গাইতে। কুকড়োর মতো শিল্পী কিভাবে অগ্রাহ্য করেন তার কর্তব্যবোধকে। তাই একদিন তাকে ফিরতেই হলো তার গোলাবাড়িতে। দিনের আলোকে ডেকে তোলার জন্য। ক্ষুদ্রজীবনের বন্ধন থেকে মঞ্চের জীবনের ডাকে সাড়া দিয়ে কুকড়ো উৎসর্গ করলো নিজের জীবন।

'আলোরফুলকি' প্রেমের কাহিনি হলেও এটি এক শিল্পীর আদর্শবোধের কাহিনি। আলো আর সংগীতের সাধনাতেই কুকড়োর জীবনের সার্থকতা। তাই শেষপর্যন্ত সে ব্যক্তিগত ভালোবাসাকে অতিক্রম করে সৃষ্টির উমুক্তপ্রান্তরে উপণীত হতে সক্ষম হয়েছে। তবে ছোটরা এই তাত্ত্বিক ভুবনের

পরিবর্তে 'জানবে এটা মোরগের গল্প। এক নিমেষে কুঁকড়োর রূপে, গুণে, বীরত্বে শিশু মনে কুঁকড়োকে ভালবেসে ফেলে, কুঁকড়োর পক্ষ নেয়'। [২২]

'সন্দেশ' পত্রিকায় ১৩২৭ বঙ্গাব্দে বৈশাখ থেকে মাঘ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে 'খাতাঞ্চির খাতা' প্রকাশিত হয়। জেমস ম্যাথু ব্যারীর 'পিটার প্যান' উপন্যাসের ভাবানুবাদ রূপে পরিচিত হলেও 'খাতাঞ্চির খাতা' অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃজন। কর্তা (খাতাঞ্চি), গিন্নি, এক মেয়ে (সোনা) , দুই যমজ ছেলে (আঙুটি - পাঙুটি), ভৃত্য (সোনাতন), এক পরীশিশু (পুতু) কে নিয়ে 'খাতাঞ্চিরখাতা'। এই চরিত্রগুলি পিটার প্যানের চরিত্রদেরই বাঙালিকরণ। 'প্যানের মিঃ ও মিসেস 'ডারলিং' অবনীন্দ্রনাথের হাতে পরিণত হয়েছে খাতাঞ্চি ও তার স্ত্রীতে, তাদের তিন সন্তান সোনা, আঙুটি - পাঙুটিও ডারলিং দম্পতির সন্তানদেরই অনুসরণ। এমনকি তাদের পোষ্য কুকুর 'নোনা' পর্যন্ত হবহু 'খাতাঞ্চিরখাতার' 'বহিম' হয়ে উঠেছে। তবে পিটারের সঙ্গে পুতুর চরিত্রগত প'র্থক্য লক্ষ্য করা যায় এখানে।

খাতাঞ্চি হাড়কিপটে। তার কাছে অর্থের থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য এই পৃথিবীতে কিছুই নেই আর। তার খেরো বাঁধানো জাবদাখাতাতে প্রতি মুহূর্তে টুকে রাখেন সমস্ত হিসেব-নিকেষ। তার কিপটেমির পরিচয় পাওয়া যায়, তার প্রথম সন্তান সোনা জন্মানোর পর। বহুদিনের পুরানো ভৃত্য সোনাতন সদ্যপ্রসূত সন্তানের খবর এনে জানালো —

> *"... 'কত্তার মেয়ে হল, এবার বখসিস্ চাই।'*
> *খাতাঞ্চি তাকে ধমকে বল্লেন — "বাজে বকচিস্ ফের!"*
> *তারপর সোনাতনের হাতে একটি আধলা পয়সা দিয়ে খরচের*
> *ঘরে খাতায় লিখলেন — "প্রথম কন্যার জন্মোপলক্ষে বখসিস্ বাবদ বাজে*
> *খরচ আধ পয়সা।" অমনি মনটা ছাৎ করে উঠলো। একটুভেবে খাতাঞ্চি*
> *খরচের পাতায় জের টানলেন — "সোনাতনের হাওলাতবাদ তাহার গত*
> *বৎসরের মাহিনা দেওয়া যায় আধ পয়সা।"*

এইরকম খরচের খাতার পাশাপাশি এখানে অন্য একটি খাতারও উল্লেখ আছে । সে খাতাটি পরীকুমারী পুতুর। 'শিশুচিত্তের স্বপ্ন জাগরণের প্রতীক'[২৩] সবুজ খাতাটিতে পুতু রঙিন স্বপ্নময় কল্পনার মায়াজগৎ লিখে রেখেছে। আসলে —

> *"সব ছেলের মনের সিন্দুকে একটি কোরে লুকানো দেরাজ আছে। চাবি*
> *ছেলেরা হারিয়ে ফেল্লে মুস্কিল হবে, তাই এই লুকানো দেরাজের চাবি নেই;*
> *একটা কোরে কীল আচে, সেইটে সরিয়ে দিলেই দিরাজটি আপনি খুলে যায়।*
> *সেইখেনে সবার সবুজ পাতায় বাঁধানো এতটুকু খেলার খাতাখানি। .... যতদিন*
> *না নিজের মনের সিন্দুক তারা নিজেরা গোছাতে পারে ততদিন কোন*

ছেলেমেয়ে এই লুকানো খাতার সন্ধান পায় না।"

পুতুর আগমন হঠাৎ ও আকস্মিক। যাত্রা দেখার জন্য যে দৃশ্যের সৃষ্টি করলেন অবনীন্দ্রনাথ সেখানেই পুতুর আবির্ভাব। কল্পনাপ্রবণ মনের অধিকারী পুতুর খাতায় কোলকাতার অদ্ভুত মানচিত্র পাওয়া যায়। সে যেন সর্বত্রগামী —

> *"আতাগাছের বাসায় ঘুঘু পুতুকে ঘুম পাড়িয়ে নদীতে চান করাতে গেল। পুতু এতক্ষণ মটকা-মেরে চোখ বুজে ছিল। সে অমনি আস্তে আস্তে উঠে বাসা ছেড়ে আতাগাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে একটা বাঁশী বাজাতে লাগল।"*

এইভাবে সর্বত্র পুতুর উপস্থিতি যেন শিশুমনের কল্পনায় গগনাভিমুখী অভিযাত্রারইপ্রতীক। পিটার ও পুতু দুজনেই শৈশবের প্রতীক। তারা কেউই শৈশব কাটিয়ে বড় হতে চায়নি। অবনীন্দ্রনাথ তাই সোনার মুখ দিয়ে বলিয়ে নিলেন —'না মা, তুমি জানো না। পুতু তো কখনো বড়ো হবে না, চিরকাল সে ঠিক এই আমি যতটুকু এতটুকু থাকবে।' তাই বহু মিল ও অমিলসত্ত্বেও পিটার প্যান ও পুতু যেন অভিন্ন হৃদয়ের। তবে লেখকের বর্ণনাগুণে পুতু আদ্যন্ত বাঙালি ঘরের নন্দিনী হয়ে উঠেছে।

সুইডিস লেখিকা সেলমা লাগেরলফের 'The wonderful Adventures of Niles' গল্পের অনুপ্রাণিত হয়ে 'মৌচাক' পত্রিকায় (১৯২০-২১) অবনীন্দ্রনাথ 'বুড়ো আংলা' লেখেন। বুড়ো আঙুলের মাপের বিদয়কে নিয়ে এই কাহিনি বলেই, বইয়ের নাম 'বুড়ো আংলা।' এখানে সংকলিত গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'আমতাল', 'চলনবিল', 'শৃগাল', 'যোগী-গোফা' ইত্যাদি।

এ গল্পের নায়ক হৃদয় বলে এক বালক। অবশ্য গ্রাম্য উচ্চারণে সে 'হৃদয়' নয় 'রিদয়'। আমতলির লোকজন তার উপর মোটেও সন্তুষ্ট ছিল না। কেননা 'রিদয় বলে ছেলেটার নামই হৃদয়, দয়ামায়া একটুও ছিল না'। তার উৎপীড়নে পাড়াশুদ্ধ মানুষ,পশু-পাখি বীতশ্রদ্ধ ছিল। এমনকি দুষ্টুমি করতে গিয়ে সে একদিন চটিয়ে দিল স্বয়ং গনেশ ঠাকুরকে। গনেশ ঠাকুরকে জাল দিয়ে আটকে সে পড়ল বিষম বিপদে। রেগে গিয়ে গনেশ তাকে অভিশাপ দিলেন, 'এতবড় আস্পর্ধা! - ব্রাহ্মণ আমি, আমার গায়ে চিংড়ি মাছের জল ছোঁয়ানো! যেমন ছোটলোক তুই, তেমনি ছোট বুড়ো আংলা যক্ হয়ে থাক।' শুরু হল তার দুর্গতি। যক্ থেকে পুনরায় মানুষ হতে পারবে কিন সে চিন্তায় সে যখন জেরবার, তার মানসিক দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিল গনেশ ঠাকুরের ইঁদুর। যক্-জীবনের দুর্গতির কথা তাকে স্মরণ করিয়ে ইঁদুর তার প্রতিশোধ নিল।

এরপর শুরু হয় রিদয়ের অভিযান। বাড়ির পোষা সুবচনীর খোঁড়া হাঁসের পিঠে চড়ে বুনো হাঁসের দলে ভিড়ে সে কৈলাশের দিকে উড়ে চলে। শুরু হয় বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিক্রমণ। বুড়ো আংলা আসলে বাংলাদেশের ভূগোলের গল্প। গুগুলি মহাশয় কৈলাসের ঠিকানা

জানিয়ে বলে —

> *"এই আমতলি, ইহার পর জামতলি, তেঁতুলতলি, বটতলি - অমনি পরপর কত যে গ্রাম তার ঠিকানা মেলে না। ... তাহার পর উপত্যকা, উপত্যকাবাদ পাহাড়তলি, তৎপরে চিত্রকূট, পরেশনাথ চন্দ্রনাথের পাহাড়-পর্বত, তাহার পর বিন্ধ্যাচল, তাহারপর সীমাচল, তবে হীমাচল! তৎপরে রামগিরি, তাহার পরে ধবলগিরি তৎপরে মানসসরোবর, উহার ও ধারে তিব্বত, আরো ও ধারে কৈলাস পর্বত।"*

খোঁড়া হাসের পিঠে অভিযানে বেরিয়ে প্রতিমুহূর্তে নতুন নতুন বিপদে পড়েছে রিদয়। অলৌকিক উপায়ে মুক্তি পেয়েছে সেখান থেকে। প্রতি মুহূর্তে মানসিক যন্ত্রণায় ক্লীষ্ট হতে হতে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে —

> *"কোনো দিন সন্দেশ চুরি করে খাবনা, খেয়ে আর মিছে কথা বলব না, পড়বার সময় আর মিছিমিছি মাথা ধরবে না, তেষ্টাও পাবেনা; গুরুমশায়কে দেখে আর হাসব না, বাপ মায়ের কথা শুনব; রোজ তোমার চন্নামেত্তো খাব, একশ দুর্গানাম লিখব। এবার থেকে বামুনের দোকানের পাঁউরুটি আর হাঁসের ডিম ছাড়া অন্য কিছু ছুঁইতো গঙ্গাস্নান করব"।*

এই মানসিক রূপান্তর নিষ্ঠুর 'রিদয়'কে 'হৃদয়' এ রূপান্তরিত করেছে। ফলে মুহূর্তে ভেঙে যায় তার স্বপ্ন। তার পেটমোটা গনেশের মতো বাপ ঘরে ঢুকে তার ঘুম ভাঙায়। রূপকথার মায়াবী জগৎ থেকে সে এসে পড়ে বাস্তবে। 'বুড়ো আংলা'র ভয়াবহ অভিজ্ঞতা ভুলে সে যখন পুনরায় দুরন্তপনায় মেতে উঠেছে, তখনই তার মা এসে চেঁচিয়ে বলেন - 'এত বড়োটি হলি তবু তোর ছেলে মানষি গেলনা। উঠে আয়, পাঠশালায় যাঃ'।

ছোটদের কাছে বিস্ময় জাগানোর জন্য হাজারো উপকরণ রয়েছে এই কাহিনিতে। ইঁদুর বোলতা, চিংড়ি মাছ, পাঠা, গোখরো সাপ, ডাঁশ, ছাতারে পাখি, প্রভৃতি জীবজন্তুর বিচিত্র জগৎ উন্মোচিত হয়েছে এখানে। ছোটদের আকর্ষণ করার পাশাপাশি এই গল্পে অপসৃয়মান মানবতাবোধের উজ্জীবনের মন্ত্র রয়েছে। কৃতকর্মের অনুশোচনায় দগ্ধ রিদয়ের মানবিক উত্তরণ এই গল্পে বড় প্রাপ্তি।

(৫)

অবনীন্দ্রনাথের অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'নালক' (১৯১৬), 'লম্বকর্ণ' (১৯৫৪), 'মারুতির পুঁথি' (১৯৫৬), 'বাদশাহীগল্প' (১৯৭১), প্রভৃতি। সরাসরি রূপকথার আঙ্গি কে লেখা না হলেও এই গল্পগুলিতে আছে রূপকথার আমেজ। 'নালক' (১৯১৬) গ্রন্থটিতে জাতকের গল্প বলতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ রূপকথার জাল বুনেছেন। ছোট্ট ছেলে নালক বর্ধনের বনে ধ্যানে

বসে গৌতম বুদ্ধের জন্ম দেখেছিল মানসচক্ষে। খোড়ো চালের পাঠশালায় পড়তে পড়তে ছোট্ট নালক রোজ ভাবত কোথায় পালিয়ে যাবে। একদিন সত্যি সত্যি সে মাকে চোখের জলে ভাসিয়ে দেবল ঋষির সঙ্গে বনে চলে গেল। ধ্যানে বসে দেখতে পেল সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ থেকে বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি পর্যন্ত একের পর এক ঘটনা। নালক রয়েছে ঋষিপত্তনের পাহাড়ে সারনাথ মন্দিরের পাশে এক তপোবনে। ... তারপর কতদিন কেটে গেছে। একদিন বিকেলবেলায় বরুণা নদীর তীরে বসে বুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করছিল নালক। তার গায়ে শেষ বিকেলের পড়ন্ত রোদ। দূর থেকে ভেসে আসছে মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি। সামনে দিয়ে ছলছল শব্দে বয়ে চলেছে বরুণা নদীর নীল জল। হঠাৎ নালকের মন বিষন্ন হয়ে গেল। সে আজ কতদিন ঘরছাড়া, মায়ের কোলছাড়া। নদীর জলের সঙ্গে তার মন ছুটল বর্ধনের বনের ধারে এক ছোট্ট গাঁয়ে,যেখানে তেঁতুল গাছের ছায়ায় ঢাকা মাটির ঘরে জল ভরা চোখে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে মা। ঘরে ফেরে সে। নালকের এই গল্পে ছোট্ট নালকের চোখ দিয়ে আমরা মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করি গৌতম বুদ্ধের সারা জীবনের ছবি। রাজরাণী মায়াদেবীকে নিয়ে কাহিনির সূত্রপাত যেন রূপকথার মতোই মায়াময়—

> *"রাজরাণী মায়াদেবী সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছেন। ঘরের সামনে খোলা ছাদ, তার ওধারে বাগান, শহর, মন্দির, মঠ..."*

অবনঠাকুর তাঁর চিরচেনা বাংলাদেশের ছবি এঁকেছেন নালকের গল্পে। বিশেষ করে গল্পের শেষে নালক যখন ফিরে এসেছে তাঁর নিজের গ্রামে, নিজের ঘরে, তখন গৃহগতপ্রাণ বাঙালির মতোই নিজের চেনা রূপসী বাংলাকে কথক অবনীন্দ্রনাথ স্বপ্নের মতো মায়াময় চোখে উপলব্ধি করেছেন—

> *"তিনজনে মাঠ ভেঙে চলেছেন। তখনো আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে-রাত পোহাতে অনেক দেরি কিন্তু এর মধ্যে সকালের বাতাস পেয়ে গাঁয়ের উপর থেকে সারা রাতের জমা ঘুঁটের ধোঁয়া সাদা একখানি চাঁদোয়ার মতো ক্রমে ক্রমে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। উলুবনের ভিতর দু-একটা তিতির, বকুলগাছে দু-একটা শালিক এরি মধ্যে একটু একটু ডাকতে লেগেছে। একটা ফটিং পাখি শিস দিতে দিতে মাঠের ওপারে চলে গেল। ছাতারেগুলো কিচমিচ ঝুপ-ঝুপ করে কাঁটালগাছের তলায় নেমে পড়ল।"*

'মারুতির পুঁথি'তে (১৯৫৬) বললেন রামায়ণের কথা। রূপকথার কথক এখানে স্বমহিমায় উপস্থিত। কথক ও শ্রোতার অন্তরঙ্গতায় গড়ে উঠল হনুমানের গল্প, রাম-লক্ষ্মণ-রাবনের গল্প, অল-রসিদের গল্প, সিন্দবাদের গল্প। 'মারুতি পুঁথি'র কথক চাঁইবুড়োই 'চাঁইবুড়োর পুঁথি'রও কথক। এই দুটি বইতে গদ্যের লিরিক ধর্মিতা কথকতার মেজাজটি রক্ষা করেছে। দুটি গ্রন্থেরই কথক চাঁইবুড়ো তথা অবনঠাকুর নব রামায়ণ সৃষ্টি করেছেন। রামায়ণের গল্পের টানা ঘটনাবলী এখানে

দুর্লভ। নানা ঘটনা যথেচ্ছ ঢুকে পড়েছে, কিন্তু কোথাও রস ক্ষুন্ন হয় নি। পালার শুরুতে চাঁইবুড়ো মন্ত্র পড়েন:

'হুম্ গণেশ চিৎপটাং ততঃ মারুতি চিৎপটাৎ
আকাশে চিৎপটাং বাতাসে চিৎপটাং
জলে জলে কাদা-মাটিতে চিৎপটাং।।"

লক্ষণীয় যে, 'চিৎপটাং'-জাতীয় কথ্য চলিতের ব্যবহার অবনীন্দ্রনাথের কথনশৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি একইসঙ্গে তৎসম শব্দের সঙ্গে কথ্য-চলিতের সাহসী প্রয়োগ করেছেন—যা সমকালে দুর্লভ ছিল।

'মারুতির পুঁথি', 'চাইবুড়োর পুঁথি', রামায়ণ-কাহিনির উপাদান অবলম্বনে গড়ে উঠলেও অবনীন্দ্রনাথের কথনশৈলীর বৈশিষ্ট্য রূপকথার মতোই লাগামছাড়া কল্পনার জগৎ সৃষ্টি করেছে। তাই একইসঙ্গে রাম-রাবণের কাহিনি এবং সিন্দবাদের কাহিনি শোনায় চাঁইবুড়ো। কথক চাঁইবুড়ো পয়ার থেকে গদ্যে, ত্রিপদীতে যায়, আবার ফিরে আসে গদ্যে। এভাবে গদ্যে-পদ্যে কথকতা তরতর করে এগিয়ে চলে। অবনঠাকুর এভাবেই গড়ে তোলেন নিজস্ব কথনশৈলী। রূপকথার মতোই তাতে ছোটো ছোটো বাক্যে ছবির পর ছবি এঁকে তোলা হয়। এলোমেলো খেয়ালি কথাও তাতে চলে আসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে; একটা কাহিনির মধ্যে ঢুকে পড়ে অন্য কাহিনি। এমনটাতো রূপকথাতেই সম্ভব, কিন্তু এ রূপকথা শুধুমাত্র শিশুর নয়, সব বয়সের মানুষকেই তা অপ্রতিরোধ্যভাবে টানে।

অবনঠাকুরের সারাজীবনের মোট রচনার সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশো। উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও আছে 'একে তিন তিনে এক', 'কনকলতা', 'বড়রাজা ছোটরাজার গল্প', 'খোকাখুকি', 'ভোম্বলদাসের কৈলাসযাত্রা'। এখানেও বাস্তব থেকে নেওয়া উপাদান শিশুর খামখেয়ালিপনা আর উদ্ভট কল্পনার সঙ্গে মিশে অবনীন্দ্রনাথের জাদুকলমের স্পর্শে রূপকথার সামগ্রী হয়ে উঠেছে।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭ - ১৯৫৭)

(১)

রাজপুত্র, রাজা-রাণী, রাক্ষসের সঙ্গে শিশুর বিস্ময়মাখানো হৃদয়ের যোগাযোগ অনাদিকাল থেকেই। বিশেষত 'বাঙ্গালীর ছেলে যখন রূপকথা শোনে তখন কেবল যে গল্প শুনিয়া সুখী হয়, তাহা নহে— সমস্ত বাংলাদেশের চিরন্তন স্নেহের সুরটি তাহার তরুণচিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে যেন বাংলার রসে রসাইয়া লয়'। [২৪] অথচ উনিশশতকে রূপকথার নামে যে সাহিত্য পরিবেশিত হয়েছে তা বাংলার জল-হাওয়ায় লালিত নয়। জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড, প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলির লোককথা গ্রীমভ্রাতৃদ্বয়, অ্যাণ্ডারসনের সৌজন্যে বাংলায় পরিবেশিত হয়েছে অনুবাদের মধ্যদিয়ে। বঙ্গভাণ্ডারের মণিমুক্তার কথা ভুলে এইভাবে পরানুগ্রহে রসতৃপ্তি যে সমকালীন পাঠকের মনে অতৃপ্তির জন্মদিয়েছিল তার প্রমাণ মেলে রবীন্দ্রনাথের কথায়—"ঠাকুমার ঝুলিটির মত এত

বড় স্বদেশী জিনিষ আমাদের দেশে আর কি আছে? কিন্তু হায় এই মোহন ঝুলিটিও ইদানীং ম্যাঞ্চেষ্টারের কল হইতে তৈরী হইয়া আসিতেছিল।. . . কোথা গেল-রাজপুত্র পাত্তরের পুত্র, কোথায় বেঙ্গমাবেঙ্গমী, কোথায়— সাতসমুদ্র তেরোনদী পারের সাতরাজার ধন মানিক!"[২৫] বাংলার হৃদয়ের সামগ্রী রূপকথার বিচিত্র সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। রূপকথার আটপৌঢ়ে সহজ-সরল কাহিনি, রাজপুত্র, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী, অচিরেই বাঙালি শিশুর অন্তরে স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপন করলো। দক্ষিণারঞ্জন তাঁর সংকলিত কাহিনিগুলির দৌলতে হয়ে উঠলেন বাংলা রূপকথার মুকুটহীন সম্রাট।

১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের ঢাকা জেলার অন্তর্গত উনাইলে দক্ষিণারঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রমদারঞ্জন মিত্র মজুমদার ময়মনসিংহ জেলায় তাদের জমিদারী ছিল। দক্ষিণারঞ্জনের পাঁচবছর বয়সে তারা মুর্শিদাবাদ জেলায় চলে আসেন। দক্ষিণারঞ্জন গ্রামবাংলার লোকজীবনের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। গ্রামবাংলায় ছড়িয়ে থাকা অজস্র লোককথা, রূপকথা, কিংবদন্তীর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠতার সুযোগ এল ১৯০৩ সালে। বহরমপুরের পড়াশোনার পাটচুকিয়ে তিনি চলে এলেন ময়মনসিংয়ে। পদ্মাপারে রবীন্দ্রনাথ জমিদারী দেখাশোনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে কাছ থেকে চিনেছিলেন প্রকৃতি ও মানুষকে। দক্ষিণারঞ্জন পিসির জমিদারীর তত্ত্বাবধান করতে গিয়ে ছড়িয়ে পড়লেন পূর্ববাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে। সেখানে লোককথা রূপকথার ভাণ্ডারী গ্রামীণ বয়োঃবৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করলেন লোকসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এইসময় তাঁর সাথে পরিচয় হয় 'বৃহৎবঙ্গে'র লেখক ও লোকসাহিত্য সংগ্রাহক দীনেশচন্দ্র সেনের। দীনেশচন্দ্রের উৎসাহে দক্ষিণারঞ্জন তাঁর সংগৃহীত রূপকথাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। প্রকাশিত হয় 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭)। রবীন্দ্রনাথ 'ঠাকুরমার ঝুলি'র ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। বইটি এখনও পর্যন্ত শিশুদের কাছে তুমুল জনপ্রিয়। দক্ষিণারঞ্জনের প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

উত্থান(১৯০২), ঠাকুরমার ঝুলি (১৯০৭), আহুতি (১৯০৮), ঠাকুরদাদার ঝুলি (১৯০৯), সচিত্র সরলচণ্ডী (১৯০১), খোকাখুকুর খেলা (১৯০৯), আর্যনারী (১৯০৮, ১৯১০), চারুহারু (১৯১২), আসার বই (১৯১২), দাদামশায়ের থলে (১৯১৩), ফার্স্টবয়, লাস্টবয় (১৯২৭), উৎপল ও রবি (১৯২৮), কিশোরদের মন (১৯৩৪), বাংলার সোনার ছেলে (১৯৩৭), সবুজ লেখা (১৯৩৮), পৃথিবীর রূপকথা (১৯৪০), চিরদিনের রূপকথা (১৯৪৭) ইত্যাদি।

দক্ষিণারঞ্জন 'মাসিক বসুধা', 'মাসিক সারথি', 'পথ' প্রভৃতি শিশুসাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। এছাড়াও 'প্রদীপ', 'প্রকৃতি', 'ভারতী', 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকায় দক্ষিণারঞ্জনের লেখা প্রকাশিত হয়। ঢাকার 'তোষিণী' পত্রিকায় তাঁর 'চারুহারু' নামে কিশোর উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল। ছোটদের জন্য সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি তিনি যুক্ত ছিলেন বিভিন্ন শিশু-সংগঠনের সঙ্গে। তিনি কলকাতার নিখিলবঙ্গ মণিমেলা মহাসম্মেলনের প্রথম সভাপতিরূপে মনোনীত হন।

(২)

দক্ষিণারঞ্জন সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছেন তাঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি' নামক রূপকথা সংকলন গ্রন্থটির জন্য। ইতিপূর্বে বাংলার লোককথা-রূপকথা সংকলনের কাজ করেছিলেন রেভারেণ্ড লালবিহারী দে। লালবিহারী সংকলিত রূপকথাগুলি লেখা হয় ইংরেজি ভাষায়। সুতরাং আদ্যন্ত রূপকথা নিয়ে সংকলন গ্রন্থ প্রকাশের প্রাথমিক কৃতিত্ব দক্ষিণারঞ্জনের। অবশ্য দক্ষিণারঞ্জনের সমসাময়িক জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত তাঁর 'উপকথা' গ্রন্থের ভূমিকায় দাবী করেছিলেন যে, তিনিই বাংলাভাষার প্রথম রূপকথা সংগ্রাহক—'এইরূপ উপকথার পুস্তক ইহারপূর্বে বঙ্গভাষায় আর প্রকাশিত হইয়াছে কিনা বলিতে পারি না, অন্তত আমি সেইরূপ কোন পুস্তক এ পর্যন্ত দেখিনাই।' কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রশশীর এই দাবী যথার্থ নয়। Bengal Library Cataloque এর তালিকা অনুযায়ী 'ঠাকুরমার ঝুলি'র প্রথম প্রকাশ কাল ১৬ অক্টোবর ১৯০৭। আর জ্ঞানেন্দ্রশশীর 'উপকথা' প্রকাশিত হয় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে। অর্থাৎ দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি' জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্তর 'উপকথা'র ঈষৎ পূর্ববর্তী।

দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি' সংকলনের পিছনে সমকালীন যুগমানসের চাহিদা সক্রিয় ছিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গব্যবচ্ছেদ বাংলার মানুষকে ঐতিহ্যমুখী করে তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—

> *"বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ একটা উপলক্ষ স্বরূপ হইয়া সমস্ত বাঙালির হৃদয়ে এক আঘাত সঞ্চার করিতেই অমনি আমাদের যেন একটা তন্দ্রা ছুটিয়া গেল অমনি আমরা মুহূর্তের মধ্যেই চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইলাম—বহুকোটি বাঙালির সম্মিলিত হৃদয়ের মাঝখানে আমাদের মাতৃভূমির মূর্তি বিরাজ করিতেছে। বাঙলাদেশে চিরদিন বাস করিয়াও বাংলাদেশের এমন অখণ্ড স্বরূপ আমরা আর কখনো দেখি নাই।"* [২৬]

বাংলাদেশের স্বরূপ সন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে দীনেশচন্দ্র সেন ও চন্দ্রনাথ দে বাংলার ময়মনসিংহের গল্পগুলি, রবীন্দ্রনাথ 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭)-এর দুয়ার উন্মোচন করলেন। দীনেশচন্দ্রের সান্নিধ্যে এসে দক্ষিণারঞ্জন তাঁর স্বদেশ সংগ্রহের অমূল্য মণি-কাঞ্চন ছড়িয়ে দিতে চাইলেন স্বদেশি কাহিনি পরিবেশন করার আত্যন্তিক ইচ্ছায়। তাই তাঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—'ঠাকুরমার ঝুলিটির মত এত বড় স্বদেশি জিনিষ আমাদের দেশে আর কি আছে?' 'স্বদেশী জিনিষ' শব্দবন্ধ ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ 'ঠাকুরমার ঝুলি'র প্রেক্ষিত ও ইতিহাস সুচিহ্নিত করেছেন।

রূপকথা বাংলার নিজস্ব সম্পদ। বাংলার শিশুরা রূপকথা শোনে শুধুমাত্র তার কাহিনির জন্য নয়, 'বাংলাদেশের স্নেহের চিরন্তন' সুরটি সেখানে খুঁজে পায় সে। অথচ 'আধুনিক কলমের

কড়া ইস্পাতের মুখে ঐ সুরটা' কেটে যাবার সংকটকাল তখনও ছিল, আজ তা আরও ঘনীভূত হয়েছে। দক্ষিণারঞ্জন সেই আটপৌরে গ্রাম্যসুরটির সন্ধান দিলেন 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে। গ্রামবাংলার খাঁটি নির্যাসটুকু পাওয়া গেল দক্ষিণারঞ্জনের সংগৃহীত রূপকথাগুলিতে। রবীন্দ্রনাথ তাই 'ঠাকুরমার ঝুলি'র ভূমিকায় লেখেন—

> *"দক্ষিণাবাবুকে ধন্য। তিনি 'ঠাকুরমা'র মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন, তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে। রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে এতটা দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সূক্ষ্মরসবোধ ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।"*

এই সরসতা ও নিজস্বতার কারণ বোধ হয় এই যে, দক্ষিণারঞ্জন তাঁর সংগৃহীত রূপকথাগুলিতে নাগরিক হস্তাবলেপন করেননি। ময়মনসিংয়ের গ্রাম্য বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কাছ থেকে মোমের রেকর্ডে যে রূপকথা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, তা-ই তিনি অবিকৃতভাবে ও অপরিবর্তীতরূপে প্রকাশ করেছেন তাঁর গ্রন্থে। ফলে ঠাকুরমার মুখের কথাতে যেন রূপকথার নির্ভেজাল খাঁটি রূপটিই ধরা পড়েছে।

দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে প্রকাশিত রূপকথার সংখ্যা চোদ্দটি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুটি কবিতা। সংকলক দক্ষিণারঞ্জন এই রূপকথাগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন— 'দুধের সাগর', 'রূপ-তরসী' এবং 'চ্যাংব্যাং'। 'দুধের সাগর'-এ স্থান পেয়েছে ছয়টিগল্প, 'রূপ-তরাসী' ও 'চ্যাংব্যাং'-এ চারটি করে গল্প আছে। এই তিনটি বিভাগে পরিবেশিত গল্পগুলি হলো—

'দুধের সাগর'— 'কলাবতী রাজকন্যা', 'ঘমন্তপুরী', 'কাঁকনমালা কাঞ্চনমালা', 'সাতভাইচম্পা', 'শীতবসন্ত', 'কিরণমালা'।

রূপ-তরাসী— 'নীলকমল আর লালকমল', 'ডালিমকুমার', 'পাতালকন্যা মণিমালা', 'সোনার কাঠি রূপার কাঠি'।

চ্যাংব্যাং— 'শিয়ালপণ্ডিত', 'সুখু আর দুখ', 'ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী', 'দেড় আঙুলে'।

এই গল্পগুলি ছাড়াও এই গ্রন্থে 'সোনা ঘুমাল' এবং 'ফুরাল' নামে দুটি ছড়া সংকলিত হয়েছে।

(৩)

রূপকথার গল্পে সাধারণত অপুত্রক রাজার দৈবী উপায়ে পুত্রলাভের প্রসঙ্গ থাকে। কলাবতী রাজকন্যা'তে, সেই একই পদ্ধতিতে শুরু হয়েছে গল্প। এক রাজার সাতরাণী। রাজা অপুত্রক। তাই বড় দুঃখী তিনি। তারপর একদিন এক সন্ন্যাসী এলেন তার রাজ্যে। রাজার হাতে একটি শিকড় দিয়ে বললেন সাত রাণীকে বেটে খাওয়ানোর কথা। বড় ছয়রাণী ছোট রাণীকে না জানিয়ে সেই শিকড় বেটে খেয়ে নিল। ছোট রাণী জানতে পেরে সেই শিকড়বাটা শিল-নোড়া ধুয়ে তার জল

খেলেন। পরিণামে বুদ্ধু ও ভুতুম নামে তার দুটি কিম্ভূত-কিমাকার মনুষ্যেতর সন্তান জন্মালো। ছোট রাণীর লাঞ্ছনার শেষ রইল না। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধ ও ভূতুমের কল্যাণেই তার মায়ের দুঃখ ঘুঁচলো।

''সাতভাইচম্পা' গল্পেও রাজার সাতরাণী। বড় ছয়রাণী অপুত্রক। ছোটরাণী সন্তান-সম্ভবা হলে বড়রাণীরা প্রমাদ গোনে। ভাবে ছোটরাণী সন্তানের জন্ম দিলে সেই হয়ে উঠবে রাজার সর্বেসর্বা। ফলে তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। ছোটরাণী একে একে সাতটি ছেলে ও একটি মেয়ের জন্ম দিল। 'আহা ছেলে মেয়েগুলি যেন চাঁদের পুতুল—ফুলের কলি'। অন্যরাণীরা সেই সদ্য জন্মানো বাচ্চাদের হাড়ি-সরাতে করে ছাইয়ের গাদাতে পুঁতে দেয়। আর তারা প্রচার করে রাণী ইঁদুর, কাঁকড়া, বিড়াল ইত্যাদি জন্ম দিয়েছে। রাজা ছোটরাণীর উপর বিরক্ত হয়ে তাকে তাড়িয়ে দিলেন। রাণী বনের মধ্যে কুটির বেঁধে ঘুটে কুড়ানীর জীবন কাটাতে লাগল। রাণীর মাটিতে পুঁতে দেওয়া সেই সাতটি ছেলে চাঁপা বা চম্পাফুল হয়ে ফুটল। আর মেয়েটি হলো পারুল ফুল। রাজা তাদের দেখে মুগ্ধ হলেন। পরে সেই ফুল তুলতে গেলে পারুলফুল জানায় যে রাজা ও তার ঘুঁটে কুড়ানী দাসী এলেই ফুল তোলা যাবে, নচেৎ নয়। খবর পেয়ে রাজা এলেন। তিনি সব কথা শুনলেন পারুলের মুখে। পারুল ও সাত ভাই চম্পা ঝাঁপিয়ে পড়ল ছেলে মেয়ে হয়ে ঘুঁটে কুড়ানী ছোট রাণীর কোলে। বড়ো রাণীরা সমুচিত শাস্তি পেল। ছোটরাণী রাজারাণী হয়ে ছেলে মেয়ের সঙ্গে সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

'সাতভাই চম্পা'র মতো আরও একটি জনপ্রিয় গল্প 'নীলকমল আর লালকমল'। এক রাক্ষসী, লালকমল, নীলকমলের মা রাণীসেজে রাজপ্রাসাদে বাস করে। সেই রাক্ষসীর প্রাণ ভোমরা বন্দী আছে এক কৌটোয়। মায়ার দ্বারা রাক্ষসী রাণী সমস্তরাজ্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। লালকমল, নীলকমল সেই ছদ্মবেশী রাণীকে হত্যা করে রাজ্য উদ্ধার করেছে। 'ডালিমকুমার' গল্পে ডালিমের মাকে হত্যা করে রাক্ষসী রাণী ডালিমকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। এক্ষেত্রেও ডালিম রাক্ষসী রাণীকে হত্যা করে রাজ্য রক্ষা করেছে। নীলকমলের জন্ম রাক্ষসীর গর্ভে। লাল ডিমফুটে লালকমল আর নীল ডিম ফুটে জন্ম নীলকমলের। লালকমল আর ডালিমকুমারের জন্ম কিন্তু সাধারণ মানবীর গর্ভে। তৎসত্ত্বেও তারা রূপকথার নায়ক। লালকমলকে মানুষ বলে রাক্ষসের দেশে আয়ী বুড়ি তার গায়ে 'মনিষ্যি মনিষ্যি গন্ধ' পেয়েছে। ডালিম কুমার এবং লালকমলদের জয় কিন্তু রূপকথার ভালো এবং মন্দের লড়াইয়ে ভালোর জয়কে চিহ্নিত করেছে। রূপকথার বর্ণনায় অপার্থিব অলৌকিকত্ব থাকে। ডালিমকুমারের শত্রু সাপটি লেখকের বর্ণনায়—

> *''ঘরের আলো, বিদ্যুতের চমক-রাজকন্যার শরীর কাঠের মতো শক্ত—*
> *রাজকন্যার নাকের ভিতর হইতে সরু মিহি চুলের মত সাপ বাহির হইল।*
> *সেই চুল দেখিতে দেখিতে সূতা-দড়া-কাছ, তারপর প্রচণ্ড অজগর। শঙ্খের*

মত আওয়াজে সেই অজগর গর্জিয়া উঠিল।"

'চ্যাংব্যাং' এর 'শিয়াল পণ্ডিত' গল্পটির উপাদন লোককথা থেকে আহৃত। ইতিপূর্বে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এই একই গল্প সংকলন করেছিলেন। গল্পটি এক চতুর শিয়ালকে নিয়ে। বন্ধু কুমির তার সাতছানাকে শিয়ালের মতো বুদ্ধিমান তৈরি করার জন্য ভর্তি করেছিল শিয়ালের পাঠশালায়। শিয়াল মহানন্দে তাদের খেয়েছে। কুমির শিয়ালের কিছু করতে না পারলেও দৈবক্রমে শিয়াল তার উচিৎ কর্মের সাজা পেয়েছে। বেগুন ক্ষেতে বেগুনখেতে গিয়ে তার নাকে কাঁটা ফোটার পর, নাপিত শিয়ালের নাক কেটে দেয়। নাকের পরিবর্তে নাপিত তাকে নরুণ দেয়। শেষ পর্যন্ত সেই কাটা নাকের দৌলতে শিয়ালের কপালে জুটলো এক বউ। ঢুলি বউ শিয়ালের বউকে কেটে ফেললে শিয়াল পরিবর্তে পেল ঢোল। তালগাছে চড়ে মনের আনন্দে ঢোল বাজাতে গিয়ে শিয়াল পড়ে মারা গেল।

'সুখু আর দুখু' গল্পে দুষ্টু সুখু তার ঈর্ষা পরায়ণতার জন্য শাস্তি ভোগ করেছে। এক তাঁতীর দুই বউ। তাঁতীর মৃত্যুর পর বড় বউ, ছোটবউকে আলাদা করে দেয়। ছোটবউয়ের মেয়ের নাম দুখু। দুখু খুব দয়ালু আর শান্ত স্বভাবের মেয়ে। শত দুঃখের মধ্যেও সে অন্যকে সাহায্য করতে ভোলে না। সুখু ঠিক বিপরীত। সে তার মায়ের মতোই ঈর্ষাপরায়ণ। দুখু চাঁদের বুড়ির কৃপায় পুকুরে ডুব দিয়ে অফুরন্ত সৌন্দর্য লাভ করে। সঙ্গে পায় বহুমূল্যবান গয়না। দুখুর ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধি দেখে সুখুর মা হিংসেয় জ্বলে পুড়ে গেল। সে সুখুকে সৌন্দর্য ও ধনসম্পদের লোভে পুকুরে পাঠালো। সুখু লোভ সম্বরণ করতে না পেরে তিন ডুব দিল পুকুরে। ফলে মুহূর্তেই সে হয়ে গেল ভয়ানক কুৎসিৎ। তার হাতের পৌটলা থেকে অজগর বের হয়ে সুখুকে মেরে ফেললো। এইভাবে রূপকথার শেষে শুভর জয়, অশুভর পরাজয় ঘোষিত হয়েছে বারবার। দক্ষিণারঞ্জনের রূপকথাতে শুভ চিহ্নিত হয়েছে প্রাণের প্রতীকরূপে। আর অশুভ মৃত্যুর প্রতীকরূপে। ডালিমকুমার রাক্ষসের দেশে গিয়ে মৃত্যুর রাজ্যে প্রত্যক্ষ করেছে ভয়ানক নারকীয় পরিবেশ—

"হাড়ের পাহাড়ের নীচে কলকল শব্দে রক্ত-নদীর জল তোড়ে ছুটিয়াছে;
রক্তের তরঙ্গ, রক্তের ঢেউ! দাঁত বাহির করিয়া মড়ার মুণ্ড হী!হী' করিয়া
উঠে, হাড়ে হাড়ে কটাকট খটাখট শব্দ।"

(৪)

দক্ষিণারঞ্জন রূপকথার নিজস্ব আমেজ এবং চলন ঠিক ভাবেই ধরতে পেরেছিলেন তাঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে। বিশষত রূপকথার সহজাত আটপৌরে ভাষাকে তিনি যথাযথভাবে উপস্থিত করতে পেরেছিলেন তাঁর সংকলনে। কিন্তু 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' প্রকাশিত হবার পর সমালোচক মহলে বইটির ভাষা নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। ভাষার দুর্বোধ্যতা ও প্রাদেশিক বাক্যাবলী রূপকথার যথার্থ রসগ্রহণের প্রধান অন্তরায়, এইরকম মনোভাব লক্ষ করে দক্ষিণারঞ্জন তাঁর 'ঠাকুরদাদার ঝুলি'র পরবর্তী সংস্করণগুলিতে বিভিন্ন স্থলে ভাষাগত পরিবর্তন করেন। যেমন 'পুষ্পমালা' গল্পের

প্রথম সংস্করণে ছিল—

> *"রাজকন্যা শেষে পালঙ্ক মাথার বেণী উল্টাইয়া পাল্টাইয়া, মাটিতে আসিয়া শুইলেন। নাঃ—মাটি বড় শক্ত, মাটি বড় তপ্ত। পিছন দুয়ার খুলিয়া রাজকন্যা উদল মাথা, উদল গা, জলের তলে দু'খান পা, সরোবরের ঘাটে গিয়া বসিলেন।"*

'পুষ্পমালা'র দ্বাদশ সংস্করণে তিনি একেই পরিবর্তীত করে লিখলেন—

> *"রাজকন্যা শেষ পালঙ্ক উল্টাইয়া মাটিতে আসিয়া শুইলেন। নাঃ!—মাটি বড় শক্ত মাটি বড় তপ্ত! সকল অলঙ্কার ফেলিয়া দিয়া, পিছন দুয়ার খুলিয়া রাজকন্যা সরোবরের ঘাটে গিয়া জলের তলে পা রাখিয়া বসিলেন।"*

'মালঞ্চমালা' গল্পের প্রথম সংস্করণে আছে—

> *"মালঞ্চ দিল রাজরাজত্ব মুক্তি, মালঞ্চ ধরিল ঘোড়া? মালঞ্চতো হাতকাটা নাক কাটা 'অন্ধ চোক পানের বাটা' সে মালঞ্চ গেল পুত্রের সাথে সে মালঞ্চ খাইল ভূতে-প্রেতে—সে মালঞ্চ আসবে কোথায়?"*

'মালঞ্চমালা'র দ্বাদশ সংস্করণে আছে—

> *"মালঞ্চ রাজত্ব মুক্তি দিল? মালঞ্চ ঘোড়া ধরিল?—সে মালঞ্চের যে হাত কাটিয়াছিলাম, নাক কাটিয়াছিলাম, কত শাস্তি করিয়াছিলাম।—আহা! সেই মালঞ্চ এল।"*

প্রথম সংস্করণ ও দ্বাদশ সংস্করণের মধ্যে যে এই ভাষাগত রূপান্তর ও পরিবর্তন, তা রূপকথার আদি অকৃত্রিম রূপের পরিপন্থী। রবীন্দ্রনাথ 'ঠাকুরমার ঝুলি'র ভূমিকায় রূপকথার উপর 'আধুনিক কলমের কড়া ইস্পাতে'র ফলা চালনার ফলে রূপকথার স্বাভাবিকত্ব নষ্ট হওয়ার সম্ভবনা দেখেছিলেন। কেতাবী ভাষায় রূপকথার প্রকৃত বিস্তার সম্ভব নয়, একথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করেছিলেন 'ঠাকুরমার ঝুলি'র গ্রাম্য লৌকিক ভাষার। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই দক্ষিণারঞ্জন তাঁর স্বকীয়তা বর্জন করে রূপকথা বর্ণনা করতে গিয়ে লৌকিক বাক্‌রীতি পরিত্যাগ করে আশ্রয় নিলেন পরিশীলিত, মার্জিত ভাষারীতির—

> *"দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সমালোচক-গণের তাড়া খাইয়া দক্ষিণাবাবু পরবর্তী সংস্করণগুলিতে ঠাকুরদার ঝুলির ভাষা কতকটা সহজ করিয়াছেন। তাহাতে জিনিষের আদত মূল্য কতকটা কমিয়া গিয়াছে, যদিচ গল্পভুক্ সামান্য শিক্ষিত পাঠকবর্গের পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইয়াছে।"*

ভাষাগত পরিবর্তন করলেও, দক্ষিণারঞ্জন রূপকথার মূল কাহিনি প্রায় অপরিবর্তিত রেখেছেন। রূপকথার 'মোটিফ'ও চারিত্রিক লক্ষণ যাতে তাঁর সংকলিত কাহিনিগুলিতে অক্ষুন্ন থাকে, সেদিকে তাঁর সতর্ক নজর ছিল। ফলে রূপকথার প্রচুর মোটিফের সন্ধান মেলে তাঁর গল্পগুলিতে। দক্ষিণারঞ্জনের গল্পগুলিতে অপুত্রক নিঃসন্তান রাজা, ঈর্ষাপরায়ণ রাণী, সন্তান লাভের দৈবী উপায়ের মোটিফ ঘুরে ফিরে এসেছে। 'সাতভাইচম্পা' গল্পে 'কথাবলাফুল', 'যাদুফুল', 'সুখু আর দুখু' গল্প 'কথাবলা গরু', 'সোনার ফল', 'কামধেনু', 'সোনার কাঠি রূপোর কাঠি' গল্পে 'সোনার কাঠি রূপের কাঠি', 'প্রাণ ভোমরা', প্রভৃতি মোটিফ ব্যবহৃত হয়েছে। 'শীতবসন্ত'র কবিতায় 'গজমতি' মোটিফটি ব্যবহৃত হয়েছে—

"ক্ষীর সাগরে ক্ষীরের ঢেউ ঢল ঢল করে
লক্ষ হাজার পদ্মফুল ফুটে আছে থরে।
ঢেউ থই থই সোনার কমল, তা'রি মাঝে কি?
দুধের বরণ হাতির মাথে—'গজমোতি'।

দক্ষিণারঞ্জনের অধিকাংশ রূপকথাতে ঈর্ষাপরায়ণ রাণীদের খোঁজ পাওয়া যায়। তারা রাজার পুত্র কন্যাদের হত্যা করছে, জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে কিংবা পুঁতে দিচ্ছে মাটিতে। আবার কাহিনির শেষে সেই হারানো রাজপুত্র-কন্যারা ফিরে পেয়েছে নব জীবন। রাজার সম্বিত ফিরলে তিনি শাস্তির ব্যবস্থা করেন সেই দুষ্টু রাণীদের। যেমন 'সাত ভাই চম্পা'-তে ষড়যন্ত্রকারী ছয়রাণীকে রাজা হেঁটোয় কাঁটা, পিছনে কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেললেন। 'লাল কমল নীলকমলে' কৌটোর ভিতরে রাখা ভোমরাকে হত্যা করে শাস্তি দেওয়া হয় রাক্ষসী রাণীর। এইভাবে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের মধ্য দিয়ে ছোটদের মনে শুভাশুভ বোধ জাগ্রত করে রূপকথা। শিশুরা মনে মনে খারাপ লোকটির শাস্তিকামনা করে বলেই, দক্ষিশারঞ্জনের রাক্ষস কিংবা দুষ্টু রাণীরা সাজা পায়।

দক্ষিণারঞ্জনের গল্পগুলি লৌকিক জীবনের। তাই শাশ্বত লোকজীবনের সন্ধান পাওয়া যায় এখানে। সামাজিক প্রভাব, প্রতিপত্তি, সুখ, ঐশ্বর্য এবং সমানাধিকার মানুষের পারমকাঙ্খিত বিষয়। সেই অবদমিত আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটে রূপকথায়। রূপকথার রাজপুত্রেরা পাতালপুরীতে গিয়ে উদ্ধার করে আনে রাজকন্যা আর অযুত ধনরাশি। কিংবা 'দেড় আঙুলে' গল্পের দেড় আঙুল উচ্চতা বিশিষ্ট ছেলেটি তার প্রখর বুদ্ধির সাহায্যে পিতাকে ক্রীতদাসত্বের থেকে মুক্তি দিয়ে রাজত্ব ও রাজকন্যা লাভ করে। নিজের ক্ষুদ্রত্ব দীণতাকে উপেক্ষা করে উন্নততর জীবনের সন্ধান পাওয়ার দুর্দম ইচ্ছাই এখানে সক্রিয়।

রূপকথার মধ্যে সামাজিক বিন্যাসটিও ধরা পড়েছে। 'কাঁকণমালা কাঞ্চণমালা' গল্পে দাসী কাঁকণমালা রাণী কাঞ্চণমালার পোষাক পরে রাণী সেজে বসেছে। বাল্যবন্ধু রাখাল ছদ্মবেশে এসে দাসী ও রাণীর পরীক্ষার জন্য বেছে নেন 'পিটকুড়ুলির ব্রত'র অনুষ্ঠানকে। রাখালবন্ধুর নির্দেশ মতো রাণী তৈরি করেন 'অস্কেপিঠা, চাস্কে পিঠা ও সাস্কে পিঠা'। দাসী করেন 'চন্দ্রপুলি, মোহনবাঁশী, ক্ষীরমুরলী'। আলপনা দেবার সময়ও রাণীর পরাজয় ঘটলো দাসীর কাছে। সে আঁকল পদ্মলতা, সোনার সাতকলস, ধানের ছড়া প্রভৃতি। প্রমাণ হয় যে রাণীর ছদ্মবেশে আছে দাসী, আর দাসী হল

প্রকৃত পক্ষে রাণী। কেননা আস্কে পিঠে, বাস্কে পিঠে নিম্নবর্গের সংস্কৃতির অঙ্গ, আর চন্দ্রপুলি, ক্ষীরমুরলী উচ্চবর্গের সংস্কৃতির পরিচায়ক।

সবমিলিয়ে বলা চলে যে, দক্ষিণারঞ্জন ছোটদের জন্য যে রূপকথার জগৎ নির্মাণ করেছেন, সেখানে শিশুদের যাতায়াত অবাধ। কেননা আপাতভাবে যা তাদের কাছে অবাস্তব, অলীক, তা-ই পরমবাস্তব শিশুদের কাছে। শিশুমনের কাছে সবই বাস্তব—পক্ষীরাজ ঘোড়া বাস্তব, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী বাস্তব, পরী বাস্তব, কথাবলা পাখী বাস্তব, অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব বাস্তব; তার কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই। 'রূপকথাগুলিতে যে অবাস্তবতার ছড়াছড়ি তার কারণ, মূলত এগুলি শিশুদের জন্য মুখে মুখে রচিত এবং রচয়িতারাও ছিলেন শিশুর মতো সরল মনের।'[২৯] এই অপরূপ বাস্তব-সম্ভব রূপকথার জগৎ 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে বাংলার প্রাণের সম্পদ রূপে দেখা দিয়েছে বলেই ঋষি অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় 'ঠাকুরমার ঝুলি' সম্পর্কে বলেছেন—'The Book has marked out an epoch in our literature.'। জার্মানীর গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়, বা সুইস লেখক আণ্ডারসন রূপকথার গল্প সংগ্রাহক রূপে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। বাংলার দক্ষিণারঞ্জন তাঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি' বা 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' সংকলন করে, তাঁদের সঙ্গে ইতিহাসে চিরস্থায়ী আসন অধিকার করেছেন।

রূপকথার সংকলন ছাড়াও দক্ষিণারঞ্জন ছোটদের জন্য উপন্যাস লেখার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর 'চারু ও হারু' এবং 'উৎপল ও রবি' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য দুটি বই। যদিও এগুলি উপন্যাস নয়। বড় গল্প। চারু ও হারু সমবয়স্ক দুই বালক। অবস্থানগত পার্থক্যের মতই তাদের চরিত্রগত পার্থক্যও চোখে পড়ার মতো। চারু জমিদার বংশের সন্তান। তাই ধনগর্বে গর্বিত। পিতার প্রশয়ে সে প্রায় উচ্ছন্নে গেছে। অন্যদিকে হারুর জীবন কষ্ট লাঞ্ছিত। দরিদ্র হওয়ার জন্য প্রতি মুহূর্তে তাকে জবীনসংগ্রামে টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে। তৎসত্বেও সে তার মনোবল কিংবা চারিত্রিক আদর্শের কথা ভুলে যায় নি। ফলশ্রুতিতে পরীক্ষায় প্রথম হয়ে সে স্কুল ইসপেক্টরের হাত থেকে পুরস্কার লাভ করেছে। 'চারু ও হারু' উপন্যাসটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত অনুকূলশাস্ত্রী সম্পাদিত 'তোষিণী' পত্রিকায় (১৩১৮ বঙ্গাব্দ) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। 'উৎপল ও রবি' গল্পেও ধনি পরিবারের উৎপলের সঙ্গে গরিব পরিবারের রবির নিটোলবন্ধুত্ব ও ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

হেমেন্দ্রকুমার রায় ঃ (১৮৮৮ - ১৯৬৩)

(১)

'সন্দেশ' পরবর্তী কালে 'মৌচাক' (১৯২০), 'শিশুসাথী' (১৯২২), 'রামধনু' (১৯২৭), 'মাসপয়লা' (১৯২৯), 'শুকতারা' (১৯৪৭), প্রভৃতি পত্রিকায় শিশু সাহিত্যের নবযুগ সূচিত হল। অথচ কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী সৃষ্টি ব্যতীত পরাধীন ভারতবর্ষের অবিভক্ত বাংলায় শিশু সাহিত্য যেন রূপকথার রাজ্যে বন্দি ছিল। চোখের জলের প্লাবনভূমিতে অথবা কৌতুকের নির্মল ভুবনেই ছিল শিশু কিশোরদের যাতায়াত। ছোটদের এই আপাত উত্তেজনাহীন নিরুদ্বগ্নি পাঠক জীবনে প্রবল ঝঞ্ঝার মতো উদিত হলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। সুখী গৃহকোণ ছেড়ে বাঙালি কিশোর এই প্রথম পা

বাড়ালো রোমাঞ্চকর অভিযানে। শুরু হল বাংলা কিশোর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি।

সাহিত্যজীবনের সূচনায় হেমেন্দ্রকুমার (১৮৮৮-১৯৬৩) ছিলেন বয়স্ক-মনস্ক পাঠকের সুপরিচিত লেখক। 'নাচঘর' পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি বহুবিধ প্রতিভার অধিকারী হেমেন্দ্রকুমার ঔপন্যাসিক, নাট্যরসিক, গীতিকার রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২৩ সালে 'মৌচাক' পত্রিকায় প্রকাশিত 'যকের ধন' নামে কিশোর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি লেখকের জীবন বদলে দিল। খাসিয়া পাহাড়ে গুপ্তধনের খোঁজে যে অভিযান শুরু হল, তার অমোঘ আকর্ষণ আর কোনোদিনই কাটাতে পারলেন না তিনি। রহস্য-রোমাঞ্চ অভিযানের বিচিত্র জগতে তাঁর যাত্রা শুরু হল।

বাংলার জল হাওয়ায় লালিত হলেও হেমেন্দ্রকুমারের রক্তে জন্মভূমি লাহোর-পেশোয়ার প্রদেশের তেজীভাব-বীরত্বের উদ্দীপনা সদা সক্রিয়ছিল। অ্যাডভেঞ্চার এবং রহস্য কাহিনিতে তাই তাঁর বিশেষ মনোযোগ। বাংলা কিশোর সাহিত্যে মিষ্টি-মধুর কাহিনির অভাব ছিল না। অভাব ছিল 'অ্যাডভেঞ্চার বা দুঃসাহসিক কাহিনি'র। হেমেন্দ্রকুমার সেই অভাব পূর্ণ করলেন। বাংলা শিশুসাহিত্যে অ্যাডভেঞ্চার বা দুঃসাহসিক অভিযানের পথিকৃৎ হেমেন্দ্রকুমার।

হেমেন্দ্রকুমারের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী —

অজানা দ্বীপের রাণী ১৯৪৮, অদৃশ্যমানুষ ১৯৩৫, অন্ধকারের মানুষ—১৯৪১, অমানুষিক মানুষ—১৯৩৫, অমাবস্যার রাত — ১৯৩৯, অমৃত দ্বীপ—১৯৪০, অসম্ভবের দেশ—১৯৩৭, আজব দেশে অমলা—১৯৩৪, আধুনিক রবিনহুড—১৯৪০, আবার যকের ধন —১৯৩৩, আলো দিয়ে গেল যারা—১৯৫২, ইতিহাসের রক্তাক্ত প্রান্তরে—১৯৬১,এ্যালেকজেণ্ডর দি গ্রেট —১৯৫৭(জীবনী), কাউন্ট অফ মিন্টিক্রিষ্টো—১৯৫১, কিং কং —১৯৩৪, কুবের পুরীর রহস্য—১৯৬১, কুমারের বাঘা গোয়েন্দা—১৯৪৯, গুপ্তধনের দুঃস্বপ্ন—১৯৫২, গোয়েন্দা ভূত ও মানুষ—১৯৫৯, চতুভুর্জের স্বাক্ষর ১৯৫৬, চল গল্পনিকেতন—১৯৬০, ছত্রপতির ছোরা—১৯৫৭, ছায়াকায়া মায়াপুরে—১৯৪০, ছুটির ঘন্টা—ছোটদের ভালো ভালো গল্প —১৯৬১, ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প—১৯৫৮, ছোট্ট পমির অভিযান—১৯৪৯, জয়ন্তের নতুন কীর্তি—জয়ন্তের প্রতিমূর্তি —জেরিনার কণ্ঠ হার—১৯৪১, ড্রাগণের দুঃস্বপ্ন—১৯৩৯,তপোবন—১৯৫২, তারা তিন বন্ধু—১৯৪৫, দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ন—১৯৫৬, দেড়শো খোকার কাণ্ড— ১৯৪৭, নবযুগের মহাদানব—১৯৫২, নিশাচরী বিভীষিকা—নীল সায়রের অচীনপুরে—, নৃমুন্ডু শিকারী—, পঞ্চনদের তীরে, পদ্মরাগবুদ্ধ ১৯৩৮, ফিরোজা মুকুট রহস্য—, বজ্রভৈরবের —১৯৪৬, বাঘরাজার অভিযান—১৯৫৪, বিজয়—১৯২৯, বিভীষণের জাগরণ—১৯৫৯, বিশালগড়ের দুঃশাসন—১৯৪৯, ভগবানের চাবুক বা পৃথিবীপতি তৈমুর লং —১৯৪৭, ভয় দেখানো ভয়ানক—১৯৪১, ভারতের দ্বিতীয় প্রভাত—১৯৪১, ভূত আর অদ্ভুত—১৯৪৩, মড়ার মৃত্যু—১৯৩৯, ময়নামতীর মায়াকানন—১৯৩৩, মানুষের গন্ধ পাই—১৯৩৪, মানুষের প্রথম অ্যাডভেঞ্চার—১৯৩৯, মায়াকানন—১৯২৯,মুখ আর

মুখোস—১৯৪২, মৃত্যু মল্লার —১৯৪৮, মেঘদূতের মর্ত্যে আগমন—১৯৩৩, মোহনপুরের শ্মশান—১৯৪৯, মোহন-মেলা—১৯৪৭, যকের ধন—১৯২৩, যক্ষপতির রত্নপুরী —, যাদের নামে সবাই ভয় পায়—১৯৩২, রক্ত বাদল ঝরে—১৯৩৬, রত্ন পুরের যাত্রী—, রহস্যের আলোছায়া—১৯৪৪, রাত্রির যাত্রী—১৯৬১, রুনু-টুনুর অ্যাডভেঞ্চার —১৯৬০, সত্যিকার শালর্ক হোমস—১৯৫৩, সন্ধ্যার পরে সাবধান—১৯৩৪, সাজাহানের ময়ূরি—১৯৫৮, সুন্দরবনের মানুষ বাঘ—১৯৫০, সুন্দরবনের রক্ত পাগল—১৯৪৭, সূর্যনগরীর গুপ্তধন—১৯৪৪, হত্যা এবং তারপর—১৯৪৭, হিমাচলের স্বপ্ন—১৯৫২, হিমালয়ের ভয়ঙ্কর—১৯৩৫, হে ইতিহাস গল্প বলো—১৯৬১।

(২)

'গোবর-গণেশ মিনমিনে ননীর পুতুল' বাঙালি ছেলেদের ভীরু কাপুরুষ স্বভাবের দুর্নাম ঘোঁচাতে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা বলেছেন হেমেন্দ্রকুমার। কেননা 'জগতে যেসব জাতি মাথা তুলে বড় হয়ে আছে — বিপদের ভিতর দিয়ে, মরণের কুছ-পরোয়া না করে, তারা সবাই শ্রেষ্ঠ হতে পেরেছে।' ফলে সৃষ্টি হল 'যকের ধন'। এরপর লিখেছেন 'অমৃতদ্বীপ', 'সোনার পাহাড়ের যাত্রী', 'প্রশান্তের আগ্নেয় দ্বীপ', 'মান্ধাতার মলুকে,' 'নীলশায়রের অচীনপুরে', 'সূর্যনগরের গুপ্তধন', 'আবার যকের ধন' প্রভৃতি অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি। বাঙালিযুবক বিমল, কুমার, বিনয়বাবু, জয়ন্ত, মানিক, বাঘার দুঃসাহসিক কাণ্ড-কারখানা সাক্ষী হয়ে রইল এই গল্পে। ঘরের কোণে বসে একঘেয়ে জীবন কাটাত যেসব বাঙালি ছেলেমেয়েরা, তারা এই অ্যাডভেঞ্চার পড়তে পড়তে চলে যেত আফ্রিকার গভীর বনে, প্রশান্ত মহাসাগরের রহস্যে ঘেরা দ্বীপে, কখনও আসামে, কখনও সুন্দরবনে, এমনকি সুদূর মঙ্গলগ্রহে পর্যন্ত। ফলে এক আশ্চর্য জাদুমন্ত্রে আবির্ভাবের পর পরবর্তী তিন দশকে হেমেন্দ্রকুমার হয়ে উঠলেন বাংলা কিশোর সাহিত্যের মুকুটহীন সম্রাট।

'যকের ধন' হেমেন্দ্রকুমারের প্রথম অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি। খাসিয়া পাহাড়ের রূপনাথের মন্দির সন্নিহিত অঞ্চলে একটি প্রাচীন পরিত্যক্ত বৌদ্ধ মন্দিরে লুকানো গুপ্তধনের খোঁজে এই অভিযান কাহিনি। কাহিনির নায়ক দুই বাঙালি যুবক। বিমল ও কুমার। দুর্গম খাসিয়া পাহাড়ে দুধর্ষ করালী এবং তাঁর ভীষণাকৃতি সাকরেদের মোকাবিলা করে কুমার ও বিমল রোমাঞ্চকার অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। এই কাহিনি দুজন নতুন নায়ককে উপহার দিল। একজনের বয়েস সতেরো। সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র নাম কুমার, অন্যজন বিমল। বয়েসে কুমারের চেয়ে বছর তিনেকের বড়ো। বি.এ. পরীক্ষার্থী। তার গায়ে অসুরের মতো জোর—'রোজ সে কুস্তি লড়ে—দুশো ডন তিনশো বৈঠক দেয়।' পরবর্তী অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি গুলিতে এঁদের বয়স বাড়লেও রোমাঞ্চকর অভিযানে উৎসাহ ও উদ্যম কমেনি বিন্দুমাত্র।

"পাহাড়ের পর হাহাড় - ছোটো, বড়ো, মাঝারি। যেদিকে চাই কেবল পাহাড়
- কোনও কোনও পাহাড়ের শৃঙ্গের আকার বড়ো অদ্ভুত, দেখতে যেন হাতির
শুঁড়ের মতো, উপরে উঠে তারা যেন নীল আকাশকে জড়িয়ে ধরে পায়ের

তলায় আছড়ে ফেলতে চাইছে। পাহাড়গুলিকে দুর থেকে ভারি কঠোর দেখাচ্ছিল, কিন্তু কাছে এসে দেখছি সবুজঘাসের নরম মখমলে এদের গা কে যেন মুড়ে দিয়েছে।''

এই চমৎকার মনোরম বর্ণনা, আবিষ্ট করে রাখে ছোটদের। পাঠক বিমল-কুমারের চোখ দিয়ে পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে পৌঁছে যায় রহস্যেমোড়া অচীনপুরে।

প্রয়োজনে দেশের বাইরে পা বাড়াতে পিছপা হতো না তাঁরা। 'অমৃতের দ্বীপ' গল্পে 'লিটল ম্যাজেস্টিক' নামক একটি ছোট জাহাজ ভাড়া করে ভৃত্য রাম হরি, গোয়েন্দা জয়ন্ত, মানিক ও সুন্দরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে বিমল ও কুমার রহস্যময় অজ্ঞাত 'অমৃতদ্বীপের' সন্ধানে অভিযান করে। প্রশান্ত মহাসাগরের বোনিন দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব দক্ষিণ দিকে এই দ্বীপের অবস্থান। ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন এবং চীনা ধর্মগুরু লাউৎ-জুর রহস্যময় আবির্ভাবে স্বর্গের নন্দনকানন 'অমৃতদ্বীপ' অপার্থিব অনুভূতির সঞ্চার করে।

'সোনার পাহাড়ের যাত্রী'র গন্তব্যস্থল অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্বদিকে নিউগিনি অঞ্চল। সেখানকার 'উইলহেলমিনা' আর 'স্টেবেন' পাহাড়ারের মধ্যবর্তী কোন এক পর্বতে সোনার অক্ষয় ভাণ্ডার মজুত। যার নাম 'সোনার পাহাড়।' কেউ সেখানে যেতে সাহস পায় না। কেননা — 'সেখানে বাসা বেঁধে আছে বহু অভাবিত রহস্য, বহু রোমাঞ্চকর বিভীষিকা ও বহু রক্তপাগল বন্য মানুষের দল।' এখানেই সন্ধান পাওয়া যায় 'নারীদের উপত্যকা'র। সেখানে পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। প্রকৃতির উথাল পাথাল তাণ্ডবের মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক জীব 'কচ্ছপমুখো শয়তান' ডিপ্লোডোকাসের আবির্ভব শিহরণ জাগায়।

'নীল সায়রের অচীনপুরে' একটি রহস্যময় দ্বীপের কাহিনি। আটলান্টিক মহাসাগরের আর্জোস দ্বীপপুঞ্জ ও কোনারি দ্বীপপুঞ্জের মাঝখানের এই দ্বীপের গর্ভে আদিম মানুষদের সভ্যতার সন্ধান মেলে। পৃথিবীর প্রথম সত্যিকার 'ক্রো-ম্যাগনাম' প্রজাতির জীবন্ত মানুষ —

''মূর্তিটা লম্বায় ছয়ফুটের কম হবে না — দেখতেও সে সাধারণ মানুষের মতন, আবার মানুষের মতন, নয়ও। কারণ তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাধারণ মানুষের চেয়ে বড়ো ও অধিকতর পেশীবদ্ধ। তার গায়ের রঙ ফর্সাও নয়, কালেও নয় এবং সর্বাঙ্গে বড়ো বড়ো চুল। ..... সারা মুখখানায় পশুত্বের বিশ্রীভাব মাখানো। মুখে দাড়ি - গোঁফ নেই, মাথায় দীর্ঘকেশ, গায়ে উলকি এবং পরনে কেবল একটি চামড়ার জাঙ্গিয়া।''

আদিম মানুষের এই বর্ণনা 'অ্যানথ্রোপলিজ'র মান্যতা অতিক্রম করে না। অথচ খুব সহজেই অল্প বয়স্ক পাঠকদের সামনে আদিম মানুষের ছবি ফুটে উঠল। এই নিটোল বর্ণনা, তাঁর প্রতিটি অ্যাডভেঞ্চর কাহিনির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অ্যাডভেঞ্চারের গল্পগলিতে হেমেন্দ্রকুমারের ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। বিমল কুমার প্রতিটি অভিযানে ছুটে গেছে অচেনা জায়গায়। অথচ পরিবেশনের চমৎকারিত্বে তা আর অচেনা থাকে না। বরং চিরপরিচিত বলে মনে হয়। তাঁর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিগুলির গন্তব্যস্থলের একটি তালিকা করা যেতে পারে ঃ

অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি	অভিযান স্থল	বিশেষ আবির্ভাব
যকের ধন	খাসিয়া পাহাড়ে	
মেঘদূতের মর্ত্যেআগমন	প্রথমে বিলাসপুর, পরে মঙ্গলগ্রহ	মঙ্গলগ্রহের বাসিন্দা; (প্রকান্ড মাথা, ত্রিকোণাকৃতি মুখ)
সোনার পাহাড়ের যাত্রী	অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্বদিকের নিউগিনি দ্বীপ।	সোনার পাহাড়, নারীদের রাজ্য
অমৃতদ্বীপ	প্রশান্ত মহাসাগরের বোনিন দ্বীপ পুঞ্জের পূর্ব-দক্ষিণ দিকের একটি দ্বীপ	স্বর্গের নন্দনকানন, অলৌকিক লাউৎ-জুর সাধু, ড্রাগন
আবার যকের ধন	ইস্ট আফ্রিকার উজিজি	এক শৃঙ্গীহস্তী দর্শন।
নীল সায়রের অচীনপুরে	আটলান্টিক মহাসাগরের অজোর্স দ্বীপপুঞ্জের মাঝখানে নতুন একটি গিরি দ্বীপ	পৃথিবীর প্রথম মনুষ্য প্রজাতি, ক্রো-ম্যাগনান জাতির মানুষ ও তাদের উন্নত সভ্যতা
সূর্য নগরীর গুপ্তধন	কুজকো, অর্থাৎ 'সূর্যনগরী', পেরু,	স্বর্ণ সভ্যতা 'ইনকা'
প্রশান্তের আগ্নেয়দ্বীপ	প্রশান্ত মহাসাগরের রহস্যময় একটি দ্বীপ	মানুষ ও বাদরের মিশ্র একটি অদ্ভুত দর্শন জীব
রত্নপুরের যাত্রী	মিশর	—
মান্ধাতার মুল্লুকে	মধ্য আফ্রিকার অ্যাঙ্গোলার কিভু অরণ্য	আদিম রোডেশিয়ান মানুষ

অভিযানের জন্য তিনি বেছে নেন দুর্গম অঞ্চল। বাস্তবে অধিকাংশরই যার কোনো অস্তিত্ব নেই। লোককাহিনি গল্পগাথা, কিংবা কিংবদন্তী থেকে নির্যাসটুকু নিয়ে তিনি নির্মাণ করেন তাঁর স্বপ্নের সাম্রাজ্য। যেখানে বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করে অদ্ভুত রোমাঞ্চের নেশায় মেতে উঠত বিমল-কুমার-জয়ন্ত-মানিক। বাঙালি কিশোরকে তারুণ্যের শক্তিতে উজ্জীবিত করতে এই অভিযান

হেমেন্দ্রকুমারের সাহিত্যিক আয়ুধ, যার সাহায্যে বাংলার কিশোর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনিতে তিনি হয়ে উঠেছেন অগ্রপথিক-অপ্রতিরোধ্য কথাশিল্পী।

(৩)

অ্যাডভেঞ্চারের পাশাপাশি রহস্যকাহিনিতে তার অনায়াস যাতায়াত। জয়ন্ত-মানিক-সুন্দরবাবু-এই ত্রয়ী তাঁর রহস্যকাহিনির পাঠকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। গোয়েন্দা কাহিনির প্যাঁচকে অনায়াসে জমিয়ে ফেলতেন তিনি। কিন্তু অপরাধের কালিমা ছোটদের স্পর্শ করতে পারত না। গোয়েন্দা চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি ব্যোম্‌কেশ ও ফেলুদার পূর্বসূরী। তাঁর জয়ন্ত গোয়েন্দা পরাধীন ভারতবর্ষের বাঙালি তরুণদের আদর্শ —

> *"জয়ন্তের বয়স একুশ-বাইশের বেশি হবে না ..... তার মতন দীর্ঘদেহ যুবক বাঙালি জাতির ভিতরে বড়ো একটা দেখা যায় না — তার মাথার উচ্চতা ছয় ফুট চার ইঞ্চি। ..... রীতিমতো ডন-বৈঠক, কুস্তি, জিমনাস্টিক করে নিজের দেহ খানিকেও সে তৈরী করে তুলেছিল! বাঙালিদের ভিতরে সে একজন নিপুন মুষ্টিযোদ্ধা বলে বিখ্যাত।" (জয়ন্তের কীর্তি)*

এই প্রখর বুদ্ধিমান ও ঋজু বলিষ্ঠ বাঙালি চরিত্র তাঁর আদর্শ ও মননের ফসল। কেননা - 'মেজাজ ও জীবনদর্শনে তিনি শৌখিন ও মার্জিত রুচিবোধ সম্পন্ন এক উদারচেতা বনেদী বাঙালি, স্বদেশপ্রেমিক বাঙালি।'

'সন্ধ্যার পরে সাবধান', 'সোনার আনারস,' 'সর্বনাশানীলা,' 'নবযুগের মহাদাবন,' 'মরণ খেলার খেলোয়ার,' 'সাজাহানের ময়ূর,' 'জয়ন্তের কীর্তি,' 'মৃত্যুর মল্লার,' প্রভৃতি হেমেন্দ্রকুমারের বিখ্যাত গোয়েন্দা কাহিনি। জয়ন্ত ও মানিকের পাশাপাশি সুন্দরবাবুও এখানকার উল্লেখযোগ্য চরিত্র। পুলিশ অফিসার সুন্দরবাবু, জয়ন্ত ও মানিককে সহায়তা করলেও হাবেভাবে প্রায় 'ভাঁড়'। তার মুখের 'হুম' শব্দটি এক সময় বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। জয়ন্ত-মানিক ছাড়াও হেমেন্দ্রকুমার হেমন্ত ও রবিনকে নিয়ে পাঁচটি ('অন্ধকারের বন্ধু,' 'রাত্রির যাত্রী,' 'মুখ আর মুখোশ,') গোয়েন্দা কাহিনি লিখেছেন। রোমহর্ষক এই কাহিনিগুলো শিশুদের হৃদয় হরণ করেছে।

বাংলা রহস্য কাহিনিতে হেমেন্দ্রকুমার 'ত্রিভুজ' ফর্মূলার প্রণেতা। এক গোয়েন্দা এবং তার দুই সহকারী। গোয়েন্দা জয়ন্ত তার সহকারী মানিক এবং 'খাদ্য রসিক পুলিশ ইন্‌সপেক্টর সুন্দরবাবু' তাঁর রহস্যগল্পে ত্রয়ীর ভূমিকা পালন করেছে। প্রখর বুদ্ধিমান গোয়েন্দা, তার নিষ্প্রভ সহকারী এবং একজন কৌতুকসৃষ্টিকারী চরিত্রের এই ফর্মূলা পরবর্তী বাংলা কিশোর রহস্যকাহিনিতে গৃহীত হয়। স্বয়ং সত্যজিৎ রায় তাঁর ফেলুদা সিরিজে এই 'ত্রিভুজ' চারিত্রিক কাঠামো গ্রহণ করেছিলেন। জয়ন্ত মানিকের পাশাপাশি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' সিরিজের জন্য হেমেন্দ্রকুমার নিয়ে এলেন অন্য এক গোয়েন্দাকে। নাম হেমন্ত। তার সহকারী রবিন। ইনসপেক্টর সতীশবাবুকে নিয়ে গড়ে উঠেছে তাদের 'ত্রিভুজ'।

হেমন্দ্রকুমার এই ত্রিভুজ নিয়ে লিখেছেন পাঁচটি রহস্য কাহিনি। এগুলি হলো— অন্ধকারের বন্ধু, রাত্রির যাত্রী, মুখর আর মুখোস,বিভীষনের জাগরণ।

গেয়েন্দা গল্পে হত্যাকান্ড, অপরাধ একটি স্বাভাবিক উপকরণ। কিন্তু সেই উপকরণ কত রোমাঞ্চকর হতে পারে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হেমেন্দ্রকুমারের রহস্য কাহিনিগুলি। ঘটনার ঘনঘটা, চমকের পর চমক সৃষ্টি করে পাঠককে উত্তেজনার চরম শিখরে পৌঁছে দিতেন। অবশ্য গোয়েন্দাকাহিনিতে যতটা বুদ্ধির মারপ্যাঁচ থাকা দরকার, এখানে তার অভাব লক্ষ্য করা যায়। বুদ্ধির পরিবর্তে ঘটনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি। তাই বহু রহস্য কাহিনিতে অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাওয়া যায়।

অপরাধী এবং তাদের অপরাধের বিচিত্র উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় এখানে। ধুরন্ধর শক্তিশালী (যেমন অবলাকান্ত) প্রতিপক্ষ যেমন রয়েছে, তেমনি বুদ্ধিমান (ললিতা রায়) অপরাধীরও উদাহরণ রয়েছে প্রচুর। তাদের কর্মকাণ্ডে সদাব্যস্ত থাকতে হত গোয়েন্দাদের।

রহস্যগল্পে অপ্রাকৃত উপাদানও ব্যবহার করেছেন হেমেন্দ্রকুমার। 'অমাবস্যাররাত' ও 'মানুষ পিশাচ' এই রকমই দুটি কাহিনি। সুন্দরবনের কাছে মানসপুর গ্রামে এক অদ্ভুত বাঘের উপদ্রবে প্রতি অমাবস্যার রাতে মানুষের প্রাণহানির রহস্য কুমার ও বিমল উদঘাটন করেছে 'অমাবস্যার রাতে'। কালো যাদু বিদ্যার সাহায্যে ভুলু ডাকাতের বাঘে পরিণত হওয়া অপ্রাকৃত রস উদ্রেক করে। 'মানুষ পিশাচ' গল্পে জয়ন্ত - মানিক ছুটে গেছে জনশূন্য ভৌতিক নগর আলিনগরে। সেখানে তারা আবিষ্কার করে জীবনহারা জীবন্ত মানুষের দল। প্রেতসিদ্ধ নবাব মড়ার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার ক'রে, সেই জীবাস্মৃতদের দিয়ে একের পর এক অপরাধ সংঘটিত করতেন। এইভাবে অপ্রাকৃত উপাদান এবং রহস্যের মেলবন্ধন ঘটানো বাংলা রহস্য কাহিনিতে অভিনব ঘটনা।

অ্যাডভেঞ্চার ও গোয়েন্দা কাহিনির পাশাপাশি ইতিহাস, রূপকথা, অলৌকিক, ভৌতিক বিষয় নিয়েও তিনি প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর ঐতিহাসিক জীবনী গ্রন্থগুলো ছোটদের আকৃষ্ট করে। তৈমুরকে নিয়ে লেখা 'ভগবানের চাবুক', সমুদ্রগুপ্তকে নিয়ে লেখা 'ভারতের দ্বিতীয় প্রভাতে', চন্দ্রগুপ্তকে নিয়ে লেখা 'পঞ্চনদের তীরে', হর্ষবর্ধনকে নিয়ে লেখা' 'মহাভারতের শেষ মহাবীর' উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক রচনা। হেমেন্দ্রকুমারের প্রচুর রচনায় ভৌতিক উপাদান বর্তমান। 'প্রেতাত্মার প্রতিশোধ', 'মানুষ পিশাচ', 'অমানুষিক মানুষ', 'বিশাল গড়ের দুঃশাসন' ভৌতিক উপন্যাসরূপে বিখ্যাত।

অনুবাদেও হেমেন্দ্রকুমার অগ্রণী ছিলেন। বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে লেখা 'কিংকং', 'আজবদেশে অমলা' (Alice in wonderland-এর অনুবাদ) বা 'পৃথিবীর প্রথম অ্যাডভেঞ্চার' ছোটদের জন্য আদর্শ অনুবাদ গ্রন্থ রূপে সমাদৃত। বিদেশি কাহিনিকে শুধু 'অনুবাদ নয়', তাকে ছোটদের মতো করে তিনি সাজিয়েছেন। বিদেশি 'প্লটে' তিনি দেশীয় অনুষঙ্গ ব্যবহার করে যা সৃষ্টি

করলেন, তা এককথায় অনবদ্য।

'দেড়শো খোকার কাণ্ড' বা 'তারা তিনবন্ধু' ছোটদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাসির গল্প। শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র রায়, কোলকাতায় মামাবাড়ি যাবার পথে যে বিচিত্র কাণ্ডকারখানায় জড়িয়ে পরে, তারই কৌতুকময় বর্ণনা 'দেড়শো খোকার কাণ্ড'। 'তারা তিন বন্ধু'র অটল পটল নকুলের পাশাপাশি হাবুবাবুও দম ফাটানো হাসির উপকরণ। যা সহজেই শিশু-কিশোরকে আকৃষ্ট করে।

হেমেন্দ্রকুমারের সাহিত্য জগত ছিল শিশু কিশোরদের জন্য নিবেদিত। ইতিহাস ও ভূগোলের সার্থক মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন তিনি। চিত্তাকর্ষক গল্প বলায় তিনি অদ্বিতীয়। চরিত্র সৃষ্টিতেও সিদ্ধপুরুষ। ফলে সংহত ও জোরালো ভাষার সাহায্যে তিনি যে কাহিনি উপস্থাপন করেছেন, তা বাঙালির বীরত্বের কাহিনি—বিজয়গাথা।

সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩)

(১)

'যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়ালরসের বই। সুতরাং সে রস যাহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ পুস্তক তাহাদের জন্য নহে।'

'আবোলতাবোল' (১৯২৩) গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক সুকুমার রায় যে আজগুবি ও উদ্ভটরসের জগতের দিকে পাঠক-দর্শককে প্রাণিত করেন, প্রবল হুঁশিয়ারী দেন শিশু ও কিশোর মনস্ক হওয়ার জন্য —সেই কাল্পনিক, সরস অথচ প্রত্যয়ী জগৎ সুকুমারের মন ও মননের সঙ্গে তাঁর লেখার জগতের সেতুবন্ধ রচনা করেছে। তাঁর সাহিত্য এবং ব্যক্তিজীবন এই শিশুমনস্কতার চিহ্নবাহী। শিশুদের জন্য অথবা শৈশবোত্তীর্ণ পাঠকের জন্য তাঁর রচনা এমন এক অনাবিল ভালোলাগার জগৎ উপহার দেয়, যা সহজেই তাত্ত্বিক বিতর্কের উর্দ্ধে উঠে সুকুমার রায়কে বংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অভিষিক্ত করেছে। মসুয়ার রায় পরিবারের এই কৃতি সন্তান বাংলা শিশু সাহিত্যে নির্মল হাস্যরস ও সূক্ষ মেধার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। ফলে তাঁর শিশুসাহিত্য নাগরিক বাক্‌চাতুর্যে কর্তিত দ্যুতিময় হীরকখণ্ড রূপে অনন্য ও অসাধারণ হয়ে উঠেছে।

সাহিত্যরুচির পারিবারিক ঐতিহ্য সুকুমার জন্মসূত্রে লাভ করেছেন। মসুয়ার বিখ্যাত রায়চৌধুরী পরিবারের সন্তান তিনি। পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বাংলা মূদ্রণ শিল্পের উৎকর্ষ সাধনে সমস্তজীবন উৎসর্গ করেছেন। বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি উজ্জ্বল নক্ষত্র। 'টুনটুনির বই' এ মুগ্ধ করেছেন বাংলার ক্ষুদে পাঠককূলকে। এহেন পিতার সাহচর্যে সুকুমার শৈশব থেকে সাহিত্যানুরাগী। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি ফটোগ্রাফীতেও তাঁর প্রতিভার স্ফূরণ ঘটেছে।

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর, (১৩ই কার্তিক, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ) কলকাতার ১৩নং,

কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের বাড়িতে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর দ্বিতীয় সন্তান সুকুমার জন্মগ্রহণ করেন। মা ছিলেন বিধুমুখী। সুকুমার শৈশবেই সাহিত্যের পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। সুকুমারের প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা, তাঁদের কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের বাড়ির নিজস্ব বিদ্যালয়ে (পরে এটি সার্কুলার রোডে উঠে যায়)। এরপর তিনি ভর্তি হন সিটি স্কুলে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখান থেকে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে অনার্স সহ বি.এস.সি পাশ করেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ফটোগ্রাফি ও মুদ্রণশিল্পে উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত 'গুরুপ্রসন্ন ঘোষ স্কলারশিপ' নিয়ে বিলেতে যাত্রা করেন। সেখানে 'লণ্ডন কাউন্টি স্কুল অফ ফটোএনগ্রেভিং অ্যান্ড লিথোগ্রাফি' এবং 'মিউনিসিপ্যাল স্কুল অফ টেকনোলজি'তে 'ক্রোমোলিথোগ্রাফি' ও 'লিথোড্রয়িং' নিয়ে পড়াশুনা করেন। দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে 'রয়েল ফটোগ্রাফিক সোসাইটি'র সদস্য মনোনীত হন। ১৯১৫খ্রিস্টাব্দে পিতা উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের মাঘসংখ্যা থেকে 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন। মূলত 'সন্দেশ' পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই সুকুমারের সাহিত্য প্রতিভা পূর্ণবিকশিত হয়েছে। স্বল্পায়ু এই তরুণ প্রতিভা আমৃত্যু (১৯২৩ খ্রিঃ, ১০ই সেপ্টেম্বর) যুক্ত ছিলেন এই পত্রিকার সঙ্গে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সুকুমার সমান্তরালভাবে সাহিত্য চর্চায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় মাত্র ৮ বছর বয়সে। শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত শিশুসাহিত্য পত্রিকা 'মুকুল' এর দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩) সুকুমারের 'নদী' কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

'হে পর্বত, যত নদী করি নিরীক্ষণ,
তোমাতেই করে তারা জনম গ্রহণ।
ছোট বড় ঢেউ সব তাদের উপরে,
কল্‌কল্‌ শব্দ করি সদা ক্রীড়া করে,
সেই নদী বেঁকে চুরে যায় দেশে দেশে,
সাগরেতে পড়ে গিয়া সকলের শেষে।
পথে যেতে যেতে নদী দেখে কত শোভা,
কি সুন্দর সেইসব কিবা মনোলোভা।
কোথাও কোকিলে দেখে বসি সাথী সনে,
কিসুন্দর কুহুগান গায় নিজ মনে।
কোথাও ময়ূর দেখে পাখা প্রসারিয়া
বনধারে দলে দলে আছে দাঁড়াইয়া।
নদী তীরে কতলোক শ্রান্তি নাশ করে,
কতশত পক্ষী আসি তথায় বিচরে।
দেখিতে দেখিতে নদী মহাবেগে ধায়,
কভুও যে পশ্চাতেতে ফিরে নাহি চায়।'

পরবর্তী বছরে 'মুকুলে'র তৃতীয় সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪) তাঁর 'টিকটিক-টিং' নামে অপর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এটি ই.আর.বয়স সম্পাদিত বিখ্যাত 'Hickory dickory, dock' রাইম্‌সের অনুপ্রেরণায় লিখিত —

'টিক্-টিক্-টিং
টিক্-টিক্ চলে ঘড়ি টিক্-টিক্-টিক্
একটা ইঁদুর এল সে সময়ে ঠিক।
ঘড়ি দেখে একলাফে তাহাতে চড়িল,
টং করে অমনি ঘড়ি বাজিয়া উঠিল।
অমনি ইঁদুর ভায়া লেজ গুটাইয়া,
ঘড়ির উপর থেকে পড়ে লাফাইয়া।
ছুটিয়া পালায়ে গেল, আর না আসিল,
টিক্-টিক্-টিক্ ঘড়ি বলিতে লাগিল।'

অল্প বয়সে লেখা এই দুটি কবিতার মধ্যে বালকোচিত দুর্বলতা সামান্য থাকলেও, বালক কবির প্রতিভার ঝলক এখানে দেখা গেছে। পাশাপাশি তাঁর কবিতায় অসঙ্গতিজনিত যে মজার খোঁজ মেলে, 'টিক্-টিক্-টিং' কবিতায় তারই পূর্বাভাষ লক্ষ্য করা গেল।

একটি ছবির বই ছাড়া ('অতীতের ছবি' ১৯২২) সুকুমারের জীবিতাবস্থায় তাঁর কোনো গ্রন্থ কিংবা সাহিত্য সংকলন প্রকাশিত হয় নি। তাঁর মৃত্যুর নয়দিন পর (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৩) প্রকাশিত হয় সুকুমার রায়ের প্রথম বই। 'আবোল তাবোল'।[২৮] বই না দেখে যেতে পারলেও তার তিনরঙা মলাট, অঙ্গসজ্জা, টেলপিসের ছবি ইত্যাদি সব কিছুই তিনি শয্যাশায়ী অবস্থায় করে যান। 'আবোল তাবোল' -এর শেষ কবিতাই তার শেষ রচনা। অর্থাৎ সুকুমারের অবিস্মরণীয় রচনাগুলি প্রায় সমস্তই সাহিত্যপত্রিকার জন্য অথবা ব্রাহ্ম সংগঠন কিংবা তাদের ননসেন্স ক্লাব, 'মন্ডে ক্লাব'এর প্রয়োজনে লেখা। সুকুমারের ব্যক্তি জীবন কিংবা সাহিত্য জীবনের বিকাশে এই 'ননসেন্স ক্লাব' এবং 'মণ্ডে ক্লাব' এর ভূমিকা অসামান্য। তাই এই দুটি সংগঠন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা থাকা প্রয়োজন।

কলেজ জীবনের শেষ দিকে ১৯০৬ সালে সুকুমার বাড়ির উৎসাহী সদস্যদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'ননসেন্স ক্লাব।' উদ্ভট কাল্পনিক রসের প্রতি তাঁর আবাল্য ঝোঁক, এই রকম নামকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রেরণা জুগিয়েছিল নিশ্চয়। 'ননসেন্স ক্লাব' থেকে সুকুমার হাতে লেখা একটি মুখপত্র প্রকাশ করেন। নাম 'সাড়েবত্রিশ ভাজা'। উনিশ বছরের এক তরুণ তাঁর তীক্ষ্ণ রসবোধের সাক্ষ্য দিতেই যেন এই পত্রিকায় 'পঞ্চতিক্ত পাঁচন' নামে সম্পাদকীয় ছড়া, কবিতা ও নাটক লিখেছেন। নির্মল আনন্দে ভরপুর নিটোল মজার এই পত্রিকাটির ছবি ও অলংকরণের দায়িত্ব ছিল সুকুমারের। এই 'ননসেন্স ক্লাবের' প্রয়োজনেই সুকুমার অভিনয়োপযোগী দুটি নাটক লেখেন। ১৯০৯ সালে লেখা সেই 'ঝালাপালা' ও 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটক দুটি সুকুমারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৌতুক নাটক।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে সুকুমার ব্রাহ্মসমাজের যুবকদের সংগঠিত করার কাজে নিয়োজিত হলে, এই ক্লাবটি বন্ধ হয়ে যায়।

ননসেন্স ক্লাবেরই বর্ধিতরূপ 'মণ্ডেক্লাব'। ১৯১৪ সালে সুকুমার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। ব্রাহ্মযুবকদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা বর্ধিত হয়। এই সময় ২১শে আগস্ট ১৯১৫ সালে সুকুমারের উদ্যোগে গড়পারের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'Monday Club'- অর্থাৎ 'মণ্ডাক্লাব'। (প্রথম অধিবেশন বসেছিল অমল হোমের সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে।) সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি এখানে জবরদস্ত ভূরিভোজের বন্দোবস্ত থাকতো। সমকালীন তরুণ সাহিত্য পিপাসু বহু কৃতি মানুষ এর সভ্য ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রশান্তচন্দ্র মহালানবীশ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অমলহোম, অতুল প্রসাদ সেন, কালিদাসনাগ, প্রমুখ। 'মণ্ডেক্লাব'-এর আমন্ত্রণ পত্র হত হাসির। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর রচয়িতা ছিলেন সম্পাদক স্বয়ং। এই মণ্ডাক্লাবের সভায় সুকুমার (৬ আগস্ট ১৯১৬) পাঠ করেন তাঁর বিখ্যাত নাটক 'চলচ্চিত্তচঞ্চরী'। এছাড়াও এই সভার অন্যান্য অধিবেশনে বহু রসোত্তীর্ণ লেখা পাঠ করেছেন। হিরণকুমার সান্যাল এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন - 'যে সমস্ত প্রবন্ধ তাতাদা পড়েছিলেন, তার মধ্যে যেটি আমাদের মাৎ করে দিয়েছিল, সেটি হচ্ছে বীরবলকে ব্যঙ্গ করে লেখা, ক্যাবলের পত্র।' তাতাদা, অর্থাৎ সুকুমারে তীক্ষ্ণ রসবোধের অনুশীলনে এই 'মণ্ডাক্লাব' ও 'ননসেন্স ক্লাব' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

সুকুমারের মৃত্যুর পর বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লেখা সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ শুরু হয়। তিনি নিজে কেবলমাত্র 'আবোল তাবোল' বইটির পরিকল্পনা করতে পেরেছিলেন। মৃত্যু শয্যায় তিনি বইটির চূড়ান্তরূপ সংশোধন করলেও, বইটি তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। এছাড়া তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর।

অতীতের ছবি (১৯২২, মাঘ ১৩২৯)
আবোল তাবোল (১৯২৩, ভাদ্র ১৩৩০ বঙ্গাব্দ)
হ-য-ব-র-ল (১৯৪৫, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ)
পাগলাদাশু (১৯৪০)
ঝালাপালা (১৯৪৪)
খাইখাই (১৯৫০)

এই গ্রন্থিত লেখাগুলি ছাড়াও পরবর্তী কালে বহু সংকলন প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা নিয়ে। তার সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

মূলত উদ্ভট রসের কবি রূপে তিনি প্রবল জনপ্রিয় হলেও তাঁর লেখা গল্প, নাটক এবং প্রবন্ধগুলিও খ্যাতি লাভ করেছে। জীবনী ও বিজ্ঞান বিষয়ক তাঁর প্রবন্ধগুলি অনবদ্য। নাটক ও ছোটগল্পগুলিতেও তিনি নিখুঁত চিত্রকরের মতো কৌতুকের অসামান্য ছবি এঁকেছেন। ফলে তাঁর

লেখা হয়ে উঠেছে শিশু সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র।

(২)

উদ্ভট ও আপাত অর্থহীন (ননসেন্স) কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে সুকুমার বাঙালি পাঠকের হৃদয় জয় করেছেন। তাঁর 'আবোল তাবোল' (১৯২৩) এবং 'খাইখাই' (১৯৫০) বই দুটিতে তিনি কবিতা ও ছড়ার ডানায় ভর দিয়ে পাঠকদের নিয়ে অত্যাশ্চর্য এক দ্বীপে পৌঁছুলেন - যার নাম 'ননসেন্স', সুকুমারের ভাষায় 'আবোল তাবোল'। শিল্পের প্রয়োজনে লেখক প্রায়শই নতুন নতুন শব্দ তৈরি করেন - নান্দনিক প্রয়োগের মাধ্যমে সর্বজন গ্রাহ্য করে তোলেন সেই সব শব্দকে। খাপখাড়া, উদ্ভট এমন সব শব্দও এই সৃজন প্রক্রিয়ায় উঠে আসে, যারা আপাতভাবে অর্থহীন হলেও পাঠকচিত্তে অভূতপূর্ব সাহিত্যরস সঞ্চারিত করে দেয়। জন্মদেয় অনাবিল হাস্য রসের; এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে 'ননসেন্স লিটারেচার'। শুধুমাত্র উদ্ভট শব্দ নয়, বিষয় ও বিন্যাসগত অদ্ভুতুড়ে পরিবেশ তৈরি করেও 'ননসেন্সর' সাহিত্যকে উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। সুকুমারের 'ব্যাকরণ মানিনা' ঘোষণার মধ্য দিয়ে সেইজগৎ উন্মোচিত হয়েছে শিশু কিশোরদের সামনে। ভেসে যেতে ইচ্ছে করে মেঘ মুলুকের ঝাপসা জগতে। কারণ — 'এ জগতে মায়া নেই কিন্তু আকর্ষণ আছে। স্বপ্ন নেই কিন্তু সত্যও নেই। রূপকথা নয়, কিন্তু রূপজ।'[২৯] বাংলা সাহিত্যের এই জগতের পথিকৃৎ তিনি নন ঠিকই,[৩০] কিন্তু ননসেন্সভার্সের সর্বোত্তম বিস্তার ঘটিয়েছেন তিনি তাঁর 'আবোল তাবোল' বইটিতে।

'আবোল তাবোল' বইটিতে কবিতার সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ। প্রতিটি কবিতাই হাসির বোমশেল। আপাতভাবে নিতান্ত নিরীহ গোবেচারা ধরণের এই কবিতাগুলি মুহূর্তেই হয়ে ওঠে তুবড়ি। কেননা ছোটদের বিষয়গুলি তাদের বাহ্যিক কৌতুকের আবরণ ছড়িয়ে দ্বি-মাত্রিক বা বহুমাত্রিকতায় উন্নীত হয়। ফলে ছোটদের পাশাপাশি বয়স্ক পাঠকরাও তার এই কবিতাগুলিতে সামাজিক বিচ্যুতি, রাজনৈতিক একনায়কতন্ত্র, গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে শানিত, মননঋদ্ধ ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ লক্ষ্য করেন। ফলে সুকুমার ছোটদের পাশাপাশি হয়ে ওঠেন বড়োদেরও ভাবনার বস্তু। বুদ্ধদেব বসু এপ্রসঙ্গে 'কবি সুকুমার রায়' প্রবন্ধে যথার্থই মন্তব্য করেছেন — 'সুকুমার রায়কে আমি বরাবর শ্রদ্ধা করেছি শুধু হাস্যরসিক বলে নয়, শুধু শিশুসাহিত্যের প্রধান বলে নয়, বিশেষভাবে সাবালকপাঠ্য লেখক বলেও।'

সুকুমারের কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে কবি বুদ্ধদেব বসু 'আবোল তাবোল' -এর ছড়াগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন।[৩১] প্রথম শ্রেণিতে রয়েছে 'গোঁফচুরি', 'কাতুকুতুবুড়ো', 'গানের গুঁতো', 'চোর ধরা', 'কাঠবুড়ো', 'সাবধান', 'বুঝিয়ে বলা', 'ডানপিটে', 'ঠিকানা', ইত্যাদি। এই কবিতাগুলিতে মানুষের ব্যবহারের মধ্যে অসংগতি ও অস্বাভাবিকতা প্রাধান্য পেয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণির কবিতাগুলি আজগুবি বা ননসেন্স ভার্সের ধারা অনুসরণ করেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'খিচুড়ি', 'কুমড়োপটাশ', 'হুঁকোমুখো হ্যাংলা', 'ট্যাশগরু', 'ভয়পেয়োনা' প্রভৃতি। তৃতীয় শ্রেনির কবিতাগুলি হলো 'একুশে আইন', 'সৎপাত্র', 'রামগরুড়ের ছানা', 'হাতুড়ে'। এই কবিতাগুলিতে সমাজ কিংবা ব্যক্তির আচরণগত ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি ব্যাঙ্গাত্মক মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। উদ্ভটরস

কিংবা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ব্যতিরেকে 'আবোল তাবোল'-এ আরও একশ্রেণির কবিতা আমরা লক্ষ্য করি। যেখানে কথার ঘোরপ্যাঁচ কিংবা চালাকি অথবা বিচিত্র পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নির্মল হাস্যরস পরিবেশিত হয়েছে। এই শেষোক্ত শ্রেণির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'বুড়িরবাড়ি', 'ঠিকানা', 'ডানপিটে', 'গল্পবলা', প্রভৃতি। অবশ্য স্বাভাবিক ভাবেই এই কবিতাগুলিতে সুকুমার সুলভ 'ব্যাকরণ না মানা'র প্রবণতা ও তীর্যক দৃষ্টি দুর্লক্ষ্য নয়।

মনুষ্য চরিত্রের নানান অসংগতি, বাতিক, অস্বাভাবিকতা বড়োদের মনে হাস্যরস জাগিয়ে তোলে। ছোটরাও যে অবাক বিস্ময়ে সেই অসঙ্গতি দেখে, এবং হেসে ওঠে আপন মনে, তা জানতেন বলেই সুকুমার বড়োদের নানা ধরণের অসংগতির মধ্য থেকে বেছে নিয়ে বিচিত্র স্বভাবের মানুষজনকে এনে তৈরি করেছেন তাঁর অদ্ভুত জগৎ। তাই তাঁর ছড়া কবিতায় গোঁফচুরি গেছে বলে অফিসে তুলকালাম বাঁধায় বড়বাবু, ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে গা ব্যথা হয় কিংবা এক সর্বনেশে বৃদ্ধ কাউকে একলাপেলে জোর করে গল্প শোনায় আর গায়ে লম্বা পালক নিয়ে সুড়সুড়ি দেয়। স্বাভাবিক আচরণের বাইরে হঠাৎ করে বদলে যাওয়া এই মানুষজনই সুকুমারের প্রথম শ্রেণির কবিতাগুলির 'মুড' তৈরি করেছে।

পার্থিব জগতে মানুষ হরেক রকম চুরি জোচ্চুরির কথা শুনেছেন। কিন্তু কস্মিনকালেও কেউ শোনেন নি এমনই এক অভিনব চুরির কথা শুনিয়েছেন সুকুমার। 'গোঁফচুরি' কবিতায় হেড আপিসের বড়বাবু একদিন আবিষ্কার করেন যে তার প্রিয় গোঁফটি চুরি গেছে। এমন কাজ যে অসম্ভব, তা লেখক জানেন, তাই নিজেই বড় বাবুর 'মাথার ব্যামো'র কথা উল্লেখ করেছেন — 'হেড আফিসের বড়োবাবু, লোকটি বড় শান্ত / তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনো জানতো?' কিন্তু এই বাতিক অফিসের কর্মচারীদের যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে, তার নাম কীংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। বাঙালি অফিস বসদের কাগুজে বিক্রমের সামনে বংশবদ হয়ে থাকা কর্মচারীদের করুণ চিত্র পাঠকের মনে হাসির উদ্রেক করে —

"তাই শুনে কেউ বদ্যি ডাকে, কেউ বা হাঁকে পুলিশ,
কেউ বা বলে, 'কামড়ে দেবে সাবধানেতে তুলিস।"
ব্যস্ত সবাই এদিক - ওদিক করছে ঘোরাঘুরি —
বাবু হাঁকেন, "ওরে আমার গোঁফ গিয়েছে চুরি!"

এরপর তার নির্ভেজাল গোঁফটিকে বড়বাবু অস্বীকার করে বলেন —

"নোংরা ছাঁটা খ্যাংরা ঝাঁটা বিচ্ছিরি আর ময়লা,
এমন গোঁফতো রাখত জানি শ্যামবাবুদের গয়লা।
এ গোঁফ যদি আমার বলিস করব তোদের জবাই—"

নিজের গোঁফকে এইভাবে অস্বীকার করা যে একধরণের হীনমন্যতাজনিত কারণে, তা ক্ষুদে পাঠককে বুঝতে না দিয়ে, বড়বাবুর তর্জন-গর্জনের মধ্য দিয়ে এমনএক নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি হয়েছে এই কবিতায়, যা ছোটদের সহজেই আকৃষ্ট করে।

কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার 'কংসরাজার বংশধর'কে মেয়ের বিবাহের পাত্রনির্বাচনকে কেন্দ্র করে 'সৎপাত্র' কবিতাটি লিখিত। মেয়ের বিয়ের জন্য সৎপাত্র নির্বাচন একদিকে যেমন মেয়ের বাবার কাছে পর্বতপ্রমাণ চিন্তার বিষয়, অন্যদিকে এই চিন্তা অধিকাংশক্ষেত্রেই তাদের বাতিকগ্রস্ত করে তোলে। এই বাতিকের ব্যঙ্গচিত্র যেন 'সৎপাত্র'। কবিতার পাত্রটির নাম গঙ্গারাম। কবিতার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করলে মনে হবে যেন পাত্র গঙ্গারামের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কবি —

"মন্দ নয় সে পাত্র ভাল - রঙ যদিও বেজায় কালো
তার উপরে মুখের গঠন অনেকটা ঠিক প্যাঁচার মতন।"

বোঝা যায় লেখকের উদ্দেশ্য। প্রশংসারছলে পাত্রের চরিত্রের বিভিন্ন অসংগতি প্রকাশই তার লক্ষ্য। এক কথায় বলা চলে পাত্রের নিন্দা করাই যেন মুখ্য উদ্দেশ্য। সরাসরি গঙ্গারামের চরিত্র, শিক্ষা, পরিবার এবং বংশমর্যাদার কথা বললে এইরকম দম ফাটানো হাসির উদ্রেক হতো না —

'উনিশটিবার ম্যাট্রিকে সে
ঘায়েল হয়ে থামলো শেষে।
বিষয় আশয়? গরিব বেজায়
কষ্টেসৃষ্টে দিন চলে যায়।
- - - - - - - - - - - - - - -
কিন্তু তারা উচ্চ ঘর,
বংশরাজের বংশধর।

'কাতুকুতু বুড়ো' কবিতায় এরকমই এক বিদঘুটে বুড়োর সন্ধান পাওয়া যায়। লেখক ছোটদের সাবধান করে বলেন —

'আর যেখানে যাও না রে ভাই সপ্তসাগর পার,
কাতুকুতু বুড়োর কাছে যেও না খবরদার।'

কেননা সেই সর্বনেশে বুড়ো কাউকে একলা পেলে জোর করে গল্প শোনায় আর তার 'গায়ের উপর সুড়সুড়ি দেয় লম্বাপালক লয়ে।' শ্রোতার ঘাড়ে কুটুৎ করে চিমটি কাটে,খ্যাংরা মতো আঙুল দিয়ে খোঁচা মারে পাঁজরে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সে হাসে, তার 'কিছুতে ছুটি নাই'।

সাধারণ মানুষ শুধু নয়, সুকুমারের দৌলতে রাজ-রাজরাদের 'মিথ' পর্যন্ত ধুলিসাৎ হয়ে যায়। চরিত্রের গাম্ভীর্য ও পদমর্যাদা ভুলে গিয়ে রাজা সিংহাসন ছেড়ে বসেন 'ইঁটের পাঁজা'র উপর

—

'রোদে রাঙা ইঁটের পাঁজা তার উপরে বসল রাজা
ঠোঙা ভরা বাদাম ভাজা খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না।'

রাজার এই অরাজকীয় অদ্ভুত অসংগত আচরণ অচেনা হলেও সুকুমারের প্রসাদগুনে অবিশ্বাস্য মনে হয় না —

"... ইটের পাঁজার সঙ্গে রাজার বা রাজার সঙ্গে বাদামভাজার যে কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে সেটা আমরা কল্পনাই করিনি। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই শব্দ ছন্দ ছবি সব মিলে এক আশ্চর্য নতুন অনুভূতি আমাদের সাধারণ কাব্য ও সাধারণ কৌতুকের জগৎ থেকে এক নতুন জগতে নিয়ে যায়।" [৩২]

সুকুমারের রাজারা এই রকমই - অদ্ভুত - রোমহর্ষক - পরম্পরারহিত। তাই 'বোম্বাগড়ের রাজা' কবিতায় কিংবা 'গন্ধ বিচার' কবিতাতে এই রকম সৃষ্টি ছাড়া রাজাদেরই কর্মকাণ্ড বর্ণিত হয়েছে।

সাধারণ মানুষের অসাধারণ হয়ে ওঠার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাও অনেক সময় হাস্যকর হয়ে ওঠে। তাদের বিশেষ বিশেষ গুণ সাধারণ মানুষের পক্ষে যে কী সাংঘাতিক হয়ে উঠতে পারে, তারই প্রমাণ মেলে 'গানের গুঁতো' কবিতায়। ভীষ্মলোচন সংগীত বিশারদ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার গান বিশেষ সুবিধার নয়। অন্ততপক্ষে সাধারণ মানুষের কাছে। গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন শর্মা তাই গান ধরলে দিল্লী থেকে বর্মা থরহরি কম্পমান। কেননা —

'গাইছে ছেড়ে প্রাণের মায়া, গাইছে তেড়ে প্রাণপণ,
ছুটছে লোকে চারদিকেতে ঘুরছে মাথা ভন্‌ভন্‌।
মরছে কত জখম হয়ে করছে কত ছট্‌ফট —
বলছে হেঁকে, "প্রাণটা গেলো, গানটা থামাও ঝট্‌পট্‌।"

শুধু মানুষের নয়, ভীষ্মলোচনের কর্কশ সংগীতে প্রায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে যায়—

'গানের দাপে আকাশ কাঁপে দালান ফাটে বিলকুল,
ভীষ্মলোচন গাইছে ভীষণ খোশ মেজাজে দিল্‌ খুল।'

এই প্রলয়ঙ্কর সংগীতের সমাপ্তি অবশ্য আরও সাংঘাতিক। ভীষ্মলোচনের প্রকৃত শ্রোতা যে মনুষ্যকুলের নয়, প্রাণীকুলের-তারই নিশ্চিত আশ্বাসন শোনালেন কবি —

"এক যে ছিল পাগলা ছাগল, এমনি সেটা ওস্তাদ,
গানের তালে শিং বাগিয়ে মারলে গুঁতো পশ্চাৎ।
আর কোথা যায় একটি কথায় গানের মাথায় ডাণ্ডা,
'বাপরে' বলে ভীষ্মলোচন এক্কেবারে ঠাণ্ডা।'

এইভাবে সুকুমারের কবিতায় কিছু বাতিকগ্রস্ত লোক ভিড় করেন। কেউ সোজা কথা না বলে ভালোবাসে ঘুরিয়ে বলতে ('ঠিকানা'), কেউ অকারণে অন্যদের সতর্ক করে ('সাবধান'), কেউ রাত্রি দিন ভোগে চিন্তা রোগে ('নেড়া বেলতলা যায় ক'বার'), কেউ বা ভোগে 'কাঁদুনে' রোগে (কাঁদুনে) আবার কেউ কেউ ভালোবাসে নিজের ক্ষমতা জাহির করতে ('ছায়াবাজি')।

'আবোলতাবোল'-এ সুকুমার 'ননসেন্স রাইমস' বা আজগুবি ছড়ার বিচিত্র সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। চরিত্রের বিবর্তন ঘটিয়ে তিনি একের পর এক এমন মানুষদের হাজির করেন, যারা চেনা জগৎকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারে। তাদের কেউ ছায়াধরার ব্যবসা করে ('ছায়াবাজি') কেউবা কাঠতত্ত্বে বিশারদ ('কাঠবুড়ো')। এমনকি ভূতেরও ভিন্নমাত্রিক উপস্থাপন লক্ষ করা যায় এখানে। 'ভূতুড়ে খেলা'য় মা ভূত ও খোকাভূতের আজব কাণ্ডকারখানা চলতে থাকে। জ্যোৎস্নারাতে পান্তভূতের জ্যান্ত ছানাকে খেলতে দেখে তার মার বাৎসল্যরস উথলে ওঠে। কটকট করে কাবলি বেড়ালের মতো হেসে সে বাচ্চার ঝুন্টি ধরে নেড়ে দেয়। আদর করে বাচ্চাকে বলে 'আয়রে আমার নোংরা মুখো সুঁটকো রে'। 'প্যাঁচারগান'-এও প্যাঁচা ও প্যাঁচানীর খাসা গান শুনিয়ে আসর জমিয়েছেন সুকুমার। 'হুলোর গান'-এ বদলে গেছে পশু-মনস্তত্ত্ব। হুলোর চোখে পৃথিবী—

"বিদ্‌ঘুটে রাত্তিরে ঘুট্‌ঘুটে ফাঁকা,
গাছপালা মিশ্‌মিশে মখমলে ঢাকা।'
পূর্বদিকে মাঝ রাতে ছোপ দিয়ে রাঙা
রাত কানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা।"

পরিবেশের বিচিত্র ব্যবহারও এই আজগুবি জগতের আবহ তৈরি করে দেয়—

"শুনেছ কি বলে গেল সতীনাথ বন্দ্যো?
আকাশের গায়ে নাকি টকটক গন্ধ?
টকটক থাকে নাকো হলে পরে বৃষ্টি—
তখন দেখেছি চেটে একেবারে মিষ্টি।"

'কুমড়োপটাশ', 'কিম্ভূত, 'হুঁকোমুখো হ্যাংলা', 'ভয় পেয়েনা' কবিতায় আশ্চর্য সব জন্তুজানোয়ারের সন্ধান পাওয়া যায়। 'কুমড়োপটাশ' অদ্ভুতদর্শনের জন্তু। 'কিম্ভূত' ছড়াতেও অনুরূপ একটি পশুর সন্ধান মেলে—

"হাতিটার কী বাহার দাঁতে আর শুণ্ডে—
ও রকম জুড়ে তার দিতে হবে মুণ্ডে!
ক্যাঙ্গারুর লাফ দেখে ভারি তার হিংসে—
ঠ্যাং চাই আজ থেকে ঢ্যাংঢেঙে চিমসে।"

'ভয় পেয়োনা' ছড়াতে তিন শিঙ বিশিষ্ট সিংহের পা ও শজারুর মতো লেজওয়ালা আজবদর্শন জন্তুটির উপস্থিতি ভয় উদ্রেক করার পক্ষে যথেষ্ট। তবু লেখক বৈপরীত্য সৃষ্টি করে লেখেন—

"ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়োনা, তোমায় আমি মারবনা—
সত্যি বলছি কুস্তি করে তোমার সঙ্গে পারবো না।
মনটটা আমার বড্ড নরম, হাড়ে আমার রাগটি নেই,
তোমায় আমি চিবিয়ে খাব এমন আমার সাধ্যি নেই।"

আজগুবি জগতের ছোটদের পৌঁছে দেবার পাশাপাশি সুকুমারের রচনায় প্রচলিত গতানুগতিকতার প্রতি প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপ লক্ষ করা যায়। 'বাবুরাম সাপুড়ে'র নির্বিষ সাপ সর্বংসহ বাঙালির মেরুদণ্ডহীনতা প্রকাশ করেছে। 'একুশে আইন' কবিতায় ফুটে উঠেছে শাসনতন্ত্রের প্রতি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ।

(৩)

সুকুমার ছোটদের জন্য যে গল্পবিশ্বের নির্মাণ করেছেন, সেখানেও শৈশব-কৈশোরের অমলিন দিনগুলি উঁকি দেয়। বিদ্যালয় জীবনের টুকরো-স্মৃতি পাশাপাশি বসে থাকে দুষ্ট-দামাল ছেলেদের সঙ্গে। আজগুবি জগৎ তাঁর কাহিনির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকলেও তিনি ভোলেন না বিশুদ্ধ হাস্যরস। তাঁর লেখা গল্পগুলির পরতে পরতে এই কৌতুকরস উঁকি দেয়। 'পাগলাদাশু', 'বহুরূপী', 'অন্যান্যগল্প'-এর প্রায় ৬৫টি গল্পে এবং 'হ-য-ব-র-ল', 'হেঁশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি'তে এই নির্মল কৌতুকের ভুবন ধরা পড়েছে।

'পাগলা দাশু' সুকুমারের অনবদ্য সৃষ্টি। এই বইয়ের অধিকাংশ গল্পগুলি দাশরথি ওরফে 'দাশু'কে নিয়ে লেখা। দাশুকে দেখতে পাগলাটে ধরণের। দাশু তার চেহারার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে—'আমাদের পাড়ায় যখন কেউ আমসত্ত্ব বানায় তখনই আমার ডাক পড়ে কেন জানিস? ... যখন আমসত্ত্ব শুকোতে দেয় আমি সেইখানে ছাদের উপর বারদুয়েক চেহারাখান দেখিয়ে আসি। তাতেই ত্রিসীমায় যত কাক সব ত্রাহি হাকি করে ছুটে পালায়।' তার কথা-বার্তায় চাল চলনে মুখের ভাব-ভাঙ্গিতে তার এই পাগলামী প্রকাশ পেত। মাথায় সামান্য ছিট থাকলেও মোটেই সে পাগল নয়। বরং নিত্যনতুন ফন্দিফিকির করে সে একের পর এক জব্দ করেছে সহপাঠীদের। লেখক তাই সংশয় প্রকাশ করে জানিয়েছেন—'দাশু কি সত্যি সত্যি পাগল, না কেবল মিচকেমি করে?'

স্কুলে দাশুর প্রতিপক্ষ ছিল রামপদ। রামপদ তার জন্মদিনে ক্লাসের সববন্ধুদের মিহিদানা খাওয়ালেও, দাশু বাদ পড়ে। বন্ধুদের অনুরোধে রামপদ দাশুকে মিহিদানা দিলেও শর্ত রাখে—'খাবার লোভ হয়ে থাকে তো বল্ আর আমার সঙ্গে কোনোদিন লাগতে আসবিনে'। দাশু রামপদর থেকে নেওয়া মিহিদানা রামপদর সামনেই দারোয়ানের ছাগলকে খাইয়েছে। গল্পের আসল মজা

এরপর। দাশু ঘুমন্ত পণ্ডিত মশাইয়ের চেয়ারের তলায় রামপদর মিহিদানার হাড়িতে পটকা রাখে। সেই চীনে পটকা ফেটে স্কুলে কেলেঙ্কারী কাণ্ড ঘটে। রামপদ পণ্ডিতমশায়ের কাছে মার খায়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য শ্লেটের সূত্রধরে পটকা রহস্য ভেদ হয়।

ক্লাসে জগবন্ধু ছেলেটি দাশুর উপর ওস্তাদি করতে গিয়েছিল। দাশু তাকেও উচিৎ জবাব দিয়েছে। ক্লাসে পড়াতে এসে মাস্টার মশাই গ্রামার বই চাইলে ভালোমানুষ সেজে জগবন্ধু নিজের বই এগিয়ে দিয়েছে। দাশুর কেরামতিতে বই ততক্ষণে বদলে গেছে—গ্রামার বই হয়ে গেছে রোমহর্ষক ডিটেকেটিভ কাহিনি। মাস্টার মশাই তিরস্কার করলেন জগবন্ধুকে। লজ্জায় অপমানে জগবন্ধু মাটিতে মিশে গেল যেন। উঁচুক্লাসের মোহনচাঁদ ও শায়েস্তা হয়েছে দাশুর কাছে। বাক্সের ভোজবাজিতে তাদের লবডঙ্কা দেখতে হয়েছে।

দাশুর সখ অভিনয় করা। কিন্তু ক্লাসের কেউ স্কুলের অভিনয়ে দাশুকে নিতে রাজি নয়। দাশু বারবার মিনতি জানিয়েও নাটকের কোনে পার্ট পেলো না। শেষ পর্যন্ত দেবদূতের পার্ট করবে যে গন্‌শা, তাকে ম্যনেজ দাশু দেবদূতের পার্টে নামে। নাটক ভালোই চলছিল। গোলমাল বাঁধলো শেষদৃশ্যে। ঠিক তার আগের দৃশ্যেই দেবদূত ফিরে গেছে স্বর্গে। মঞ্চে সংলাপ চলছে 'দেবদূত গেল চলি স্বর্গ অভিমুখে'—ঠিক তখনই 'আবার সে এসেছে ফিরিয়া' বলে দেবদূতরূপী দাশু মঞ্চে প্রবেশ করে। দাশুর এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে অন্যান্য অভিনেতাদের খেই হারিয়ে গেল। নাটক ভণ্ডুল হয়ে গেল।

দাশুর মতো পাগলা নয়, তবে বানিয়ে বলতে ওস্তাদ ছেলেদের দেখা মেলে সুকুমারের গল্পে। 'জগ্যিদাসের মামা', 'চালিয়াৎ' 'সবজান্তা' 'পাজি পিটার' গল্পে এই ধরণের ছেলের ভীড়। 'জগ্যিদাসের মামা' গল্পের জগ্যিদাস বানিয়ে বলতে ওস্তাদ। সে মামাকে নিয়ে বানিয়ে গল্প বলে বন্ধুদের। জগ্যিদাসের অভ্যাস ছিল আজগুবি গল্প বলার। একের পর এক অবিশ্বাস্য কাহিনি বলে যেত অবলীলাক্রমে। ছেলেরা মুগ্ধ হয়ে শুনতো সেই গল্প। 'চালিয়াৎ' ও 'সবজান্তা' গল্পেও একই রকমভাবে গুলবাজি চালিয়ে গেছে ছেলেরা। 'পাজি পিটার' গল্পের পিটার বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে বললেও তার বুদ্ধির জোরে সে বোকা বানিয়েছে সকলকে। এমনকি দেশের রাজাও বোকা বনেছে তার কাছে। সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছে ঐ বানিয়ে বলার জন্যই। এই গল্পগুলির মধ্যে অতিরঞ্জন ও বানিয়ে বলার প্রবণতা থাকলেও, সেখানে প্রবঞ্চনা বা কুটিল মনোবৃত্তির ছোঁয়া থাকে না। বরং একধরণের কল্পনা প্রবণ মনেরই সন্ধান পাওয়া যায় সেখানে।

সুকুমার রায়ের হাত ধরে বাংলা আজগুবি গল্পের ধারার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটেছে। এক্ষেত্রে 'হ-য-ব-র-ল' বইটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। সুকুমার তাঁর কবিতায় যে ব্যাকরণ না মানা জগতের কথা ঘোষণা করেছিলেন, তার সাক্ষাৎ উপস্থিতি লক্ষ করা যায় 'হ-য-ব-র-ল বইটিতে। 'হ-য-ব-র-ল'-র প্রথমেই রুমাল হয়ে যায় বেড়াল এবং বেড়াল বলে 'বেড়ালও বলতে পার রুমালও বলতে

পার, চন্দ্রবিন্দুও বলতে পার।' বলেই আচমকা উধাও হয় সে। এরপর একের পর এক চরিত্র এসে ভিড় করেছে এই বইতে। গেছোদাদা, দাঁড়কাক, হিজবিজবিজ, প্যাঁচা, ব্যাকরণ শিং। রুমাল ও বিড়ালের সমস্যার সমাধান করতে পারত গেছোদাদা। কিন্তু তার নাগাল পাওয়া মুশকিল। তার নাগাল পাওয়া যায় না বলেই গরমের হাত থেকে মুক্তির উপায় জানা যায় না।

'হ-য-ব-র-ল'র বিখ্যাত চরিত্র শ্রীকাক্কেশ্বর কুচকুচ। বিজ্ঞাপন দিয়ে তার আত্মপরিচয় ঘোষণা করেছে সে—'আমরা সনাতন বায়সবংশীয় দাঁড়িকুলীন, অর্থাৎ দাঁড়কাক।' ভবিষ্যৎ বক্তা সেই কাক্কেশ্বরের অঙ্কের নিয়ম অদ্ভুত। দাঁড়কাক লেখককে জিজ্ঞাসা করেছিল 'সাত দুগুণে' কত হয়? লেখক জানিয়েছিল চোদ্দ। দাঁড়কাক মাথা দুলিয়ে বলে—'হয়নি, হয়নি, ফেল'। কারণ হিসেবে সে বলে "... তুমি যখন বলেছিলে, তখনো পুরো চোদ্দ হয়নি। তখন ছিল তোরোটাকা চোদ্দ আনা তিন পাই। আমি যদি ঠিক সময় বুঝে ধাঁ করে চোদ্দ লিখে না ফেলতাম, তাহলে এতক্ষণে হয়ে যেত চোদ্দ টাকা এক আনা নয় পাই।" এই আজগুবি জগতে বয়সের হিসেবও প্রচলিত নিয়ম মানে না। বুড়ো বলেছে—'চল্লিশ হলেই আমরা বয়স ঘুরিয়ে দি। তখন আর একচল্লিশ বিয়াল্লিশ হয় না—উনচল্লিশ, আটত্রিশ, সাঁইত্রিশ করে বয়স নামতে থাকে।' এই বিচিত্র জগতেই আবির্ভাব ঘটেছে ব্যাকরণ শিং-এর। শ্রী ব্যাকরণ শিং বি.এ, খাদ্য বিশারদ জাতিতে ছাগল। 'ব্যা' শব্দটি তার জাত চিনিয়েছে। পৃথিবীর শিশু সাহিত্যের ইতিহাসে ব্যাকরণ শিংয়ের মতো চরিত্র আর দ্বিতীয়টি নেই। লুইস ক্যারেলের 'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড'-বইয়ের ছায়া অবলম্বনে এই বইটি লেখা হলেও সুকুমারের উদ্ভাবনী শক্তির কল্যাণে 'হ-য-ব-র-ল' পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিশু-কিশোরপাঠ্য গ্রন্থের মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারে।

(৪)

নাট্যকার সুকুমার তাঁর কবিতা কিংবা গল্পের মতো জনপ্রিয় নয়। কিন্তু তা বলে তাঁর 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' কিংবা 'ঝালাপালা' নাটকটি দিব্যচক্ষে শ্রবণ করেন নি, এমন মধ্যবয়স্ক দুর্ভাগা (বর্তমান প্রজন্ম?) বাঙালি বোধহয় বিরল। তাঁর রচিত মোট নয়টি নাটকের মধ্যে এই দুটি নাটক তাঁর ভুবনমোহিনী প্রতিভার ঝলকে উদ্দীপ্ত। নিতান্ত অল্পবয়সে লেখা এই নাটকদুটি (১৯০৯) 'ননসেন্স ক্লাব'-এ অভিনয়ের জন্য রচিত। অবশ্য তারও আগে মাত্র বারো বছর বয়সে সুকুমার লেখেন তাঁর প্রথম নাটক 'রামধন বধ' নাটক (১৯০৫)।

'রামধন বধ' নাটকটি ভারত বিদ্বেষী এক সাহেবকে নিয়ে লেখা। নাটকটির কোনো সন্ধান পাওয়া না গেলেও এ প্রসঙ্গে পুণ্যলতা চক্রবর্তী তাঁর 'ছেলেবেলার দিনগুলি' নামক (১৯৫৮) স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন —

"রামস্‌ডেন সাহেব মস্ত সাহেব, আসল সাহেবরা তার কাছে কোথায় লাগে।

'নেটিভ নিগার' দেখলেই সে নাক সিটকোয়, পাড়ার ছেলেরাও তাকে দেখলেই

চেঁচায় - 'বন্দেমাতরম'। আর সে রেগে তেড়ে মারতে আসে, বিদ্‌ঘুটে গালাগালি দেয়, পুলিশ ডাকে। এহেন 'সাহেব' কি করে ছেলেদের হাতে জব্দ হলো, তারই গল্প।''

অর্থাৎ এক ক্ষ্যাপাটে সাহেবকে জব্দ করার নাটক 'রামধন বধ'। নাটকটির রচনাকাল ১৯০৫। বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের উত্তাপ যে ভালোমতো সঞ্চারিত হয়েছিল ২২, নং সুকিয়া স্ট্রিটের উপেন্দ্রকিশোরের বাড়িতে, বালক সুকুমারের এই নাটকটি তারই প্রমাণ। বয়সে বালক হলেও সুকুমার এই নাটকে তাঁর সুবিখ্যাত রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষত নাটকে মজার মজার গানের সংযোজনা করে তিনি একটি নির্ভেজাল কৌতুকনাট্য রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। কৈশোরের গণ্ডী অতিক্রম করে সুকুমার আরও আটটি নাটক লিখেছেন। এগুলি হলো —

ঝালাপালা — ১৯০৯
লক্ষ্মণের শক্তিশল — ১৯০৯
ভাবুকসভা — ১৯১৪
শব্দকল্পদ্রুম — ১৯১৫
চলচিত্তচঞ্চরি — ১৯১৬
অবাক জলপান — ১৯২১
হিংসুটি — ১৯২১
মামাগো — ১৯২১

এদের মধ্যে 'ঝালাপালা' ও 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটকদুটি ননসেন্স ক্লাবের জন্য রচিত। নাটকগুলি 'ভাইবন্ধুদের অভিনয়ের জন্যে'। এরপর ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে সুকুমার মণ্ডে ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করলে, 'চলচিত্তচঞ্চরি' নাটকটি লেখা হয়। 'রামধন বধ্' নাটকটি ব্যতীত তাঁর অন্যান্য সব কটি নাটকই সাময়িক পত্রে মুদ্রিত হয়েছে। 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত নাটকগুলি হল 'ঝালাপালা' (বৈশাখ - আষাঢ়, ১৯১৪), 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' (আশ্বিন - কার্ত্তিক, ১৯১৪), 'অবাক জলপান' (জ্যৈষ্ঠ, ১৯২১) , 'হিংসুটি' (ভাদ্র, ১৯২১), 'মামাগো' (চৈত্র, ১৯২১)। এছাড়াও 'প্রবাসী' পত্রিকায় (আশ্বিন, ১৯১৪) প্রকাশিত হয়-'ভাবুকসভা'। 'অলকা' পত্রিকায় (কার্ত্তিক, ১৯১৪) 'শব্দকল্পদ্রুম' এবং 'বিচিত্রা' পত্রিকায় (১৯২৭) 'চলচিত্তচঞ্চরি' প্রকাশিত হয়।

সুকুমারের নাটকগুলি বিষয়ের গভীরতায় ভারাক্রান্ত নয়; কোন মহান আদর্শ কিংবা মহান চরিত্রের সন্ধানে নাট্যকার অগ্রণী নন তাঁর নাটকে। প্রায় অর্থহীন বিষয়ের সকৌতুক উপস্থাপনই তাঁর নাটকের মূলবৈশিষ্ট্য। 'দেখা যাবে, তাঁর নাটক দাঁড়িয়ে থাকে খুব ছোট এবং ভার বহনে অক্ষম কাহিনি বৃত্তের ওপর, অল্পেতেই যা পরিণতির দিকে ঝুঁকে পড়তে চায়।'[৩৩] আকৃতির দিক থেকে এই নাটকগুলি পাশ্চাত্যের 'শারাড' বা ক্ষুদ্র নাট্যরঙ্গের সমগোত্রীয়। ভাবের দিক থেকে অবশ্যই

রবীন্দ্রনাথের কৌতুকনাট্যও হেয়ালি নাটকের অনুপ্রেরণায় প্রভাবিত। তবে রবীন্দ্রনাথের মতো তিনি বয়স্ক পাঠ্য শিশুনাটিকা লেখনি,পরিবর্তে শিশু কিশোরের মন ও মেজাজকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ফলে সামাজিক সমস্যা, চাটুকারীতা, রামায়ণ কাহিনির পুর্নির্মাণ শিশুমানসজগতের কাছে সহজ সারল্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

সুকুমারের সব থেকে জনপ্রিয় নাটকের নাম 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'। পুণ্যলতা চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় যে, 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটকটি আসলে 'অদ্ভুত রামায়ণ'-এর সম্প্রসারিত রূপ। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ৭ই ও ৮ই মে সুকুমার শান্তিনিকেতনের আশ্রমে এই 'অদ্ভুত রামায়ণ' গান পরিবেশন করেন। (পরে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে এখানে 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' অভিনীত হয়।) এই রামায়ণ অদ্ভুত-ই বটে। কেননা রামায়ণের পুনর্নির্মাণ করতে গিয়ে সুকুমার এমন এক কাহিনি পরিবেশন করলেন, যা বঙ্গসাহিত্যে অভিনব। রামায়ণের রাম, রাবণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুবান, বিভীষণ তাঁদের চারিত্রিক মহিমা ভুলে প্রায় হাস্যকর কাজকর্মে লিপ্ত হয়েছেন। 'মহাকাব্যের চরিত্রদের মহাকাব্যিক বিশালতা থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের খুব ঘরোয়া, আটপৌরে এবং সমকালীন করে তোলার পরীক্ষা আছে এই নাটকে'।[৩৪]

'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটকের কাহিনি কিন্তু প্রচলিত রামায়ণের কাহিনিকে অনুসরণ করেছে। রামানুজ রক্ষ্মণের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ, রাবণের শক্তিশেলে লক্ষ্মণের আহত হওয়া এবং হনুমান কর্তৃক গন্ধমাদন পাহাড় আনয়ন এই মূলকাহিনির ক্রমটি অক্ষুন্ন রেখে তাদের আচরণ বদলে দিয়েছেন সুকুমার। মৌখিক বাগাড়ম্বর পলায়ণী মনোবৃত্তি ও চাটুকারীতার নিদর্শনরূপী সংলাপ এক্ষেত্রে অনবদ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। নাটকটি চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। এর সূচনা হয়েছে রামের অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শনের মধ্য দিয়ে আর সমাপ্তি রূপকথার সেই চিরন্তন ছড়ার ('আমার কথাটি ফুরালো / নটে গাছটি মুড়ালো') মাধ্যমে। এই চারটি অধ্যায়কে তিনি চিহ্নিত করেছেন সর্গ নামে।

নাটকের স্থান রাবণের লঙ্কা। রাম-রাবণের যুদ্ধকালীন প্রেক্ষাপটে এই নাটক রচিত। নাট্যসূচনা ঘটছে রামের একটি অদ্ভুত স্বপ্নের মধ্য দিয়ে। রাম স্বপ্ন দেখেন যে 'রাবণ ব্যাটা একটা লম্বা তালগাছে চড়ছে। চড়তে চড়তে হঠাৎ পা পিছলে একেবারে পপাত চ, মমার চ'। অর্থাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে। জাম্বুবান, প্রভৃতি সকলে যখন রাবণের মৃত্যুর আনন্দে উল্লসিত, তখনই খবর এল, রাবণ মরেনি, বরং মহাবিক্রমে লাঠি কাঁধে করে যুদ্ধ করতে আসছে। রাবনের সাথে যুদ্ধকরার সাহস দেখায় না কেউ অথচ সকলেই 'মুখে মারিতং জগৎ' শেষ পর্যন্ত সুগ্রীব যুদ্ধ করতে এগিয়ে এল। প্রথম সর্গের সমাপ্তি ঘটেছে এখানে।

দ্বিতীয় দৃশ্যের সূচনায়, প্রথমে সুগ্রীবের সঙ্গে রাবণের লড়াই এবং সুগ্রীবের পলায়ন এবং পরে লক্ষ্মণের সঙ্গে রাবণের লড়াই বর্ণিত হয়েছে। তবে একে লড়াই না বলে যুদ্ধের ক্যারিকেচার বললে অত্যুক্তি হবে না। সুগ্রীব রাবণের হাতে প্রহৃত হয়ে বলে —

"ওরে বাবা ইকী লাঠি
গেল বুঝি মাথা ফাটি নিরেট গদা ইকী সর্বনেশে।
কাজ নেইরে খোঁচাখুঁচি ছেড়ে দেভাই কেঁদে বাঁচি
সাধের প্রানটি হারাব কি শেষে?"

অথচ যুদ্ধের সূচনায় সুগ্রীব আস্ফালন করে বলেছিল —

"তবে রে রাবণ ব্যাটা
তোর মুখে মারব ঝ্যাঁটা
তোরে এখন রাখবে কেটা
এবার তোরে বাঁচায় কেটা বল্।"

এই আস্ফালনকারী বীর কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ ছেড়ে পালালেন। রাবণ তাকে দুয়োদিয়ে বললেন — "ছি, ছি, ছি - এত গর্ব করে, এত আস্ফালন করে, শেষটায় চম্পট দিলি! শেম্! শেম্!"

এরপরের ঘটনা অভাবনীয়। রাবণের শক্তিশেল হজম করতে না পেরে লক্ষ্মণ যে মূর্চ্ছা যাবেন, তা সকলেই জানেন। কিন্তু রাবণ যে একটি অত্যাশ্চর্য কাজ করবেন, তা কে জানতো! রাবণ ভূপতিত লক্ষ্মণের পকেট মারেন, আর তা দেখে হনুমান বলেন, 'অ্যাঁ। কি হচ্ছে - দেখে ফেলেছি।' রাবণের এই পকেট লুণ্ঠন এবং চম্পট দেওয়ার দৃশ্যটি অসাধারণ। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, লক্ষ্মণ, রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল লাঠি হাতে।

তৃতীয় দৃশ্যের স্থান 'রামচন্দ্রের শিবির'। যুদ্ধ থেকে পালিয়ে 'খোঁড়াইতে - খোঁড়াইতে ব্যাণ্ডেজবদ্ধ সুগ্রীবের সকাতর প্রবেশ।' তাঁর বীরত্ব সম্পর্কে সকলে বীতশ্রদ্ধ। রাম, রাবণের বীরত্বের কারণ খুঁজতে গিয়ে মধুসূদন দত্তের সংলাপ আওড়ান —

"রাবণের কেন বল এত বাড়াবাড়ি ? —
পিপঁড়ের পাখা উঠে মরিবার তরে।
জোনাকি যেমতি হায়, অগ্নি পাণে/রুষি
সম্বরে খাদ্যোত লীলা — "

জাম্বুবান তাল ঠোকে —

"আজ্ঞে ঠিক কথা
রাঘব বোয়াল যবে লভে অবসর
বিশ্রামের তরে - তখনি তো মাথা তুলি
চ্যাং পুটি যত করে মহা আস্ফালন"

এই কোলাহলের মধ্যেই আহত সংজ্ঞাহীন লক্ষ্মণকে নিয়ে বানরগনের আগমন। রামচন্দ্র সংজ্ঞাহীন

অনুজকে দেখে মূর্ছা গেলেন। জাম্ববান কর্তব্যে গাফিলতির জন্য হনুমানকে 'অষ্ট আনা জরিমানা' করলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হলেন। রামচন্দ্রর নির্দেশে জাম্বুবান লক্ষ্মণের আরোগ্য লাভের জন্য 'প্রেশক্রিপশন' লিখেছিলেন। কিন্তু হনুমান একা একা ওষুধ আনতে যেতে রাজি হল না। সে হোমিওপ্যাথি করতে বলে, বলে তার কান কট কট করছে। রামচন্দ্র তাকে বখশিসের লোভ দেখালেও সে রাতের বেলা যেতে রাজি হয় না। কেননা 'সাপে কাটবে না বাঘে ধরবে।" জাম্ববান বলে - 'যাবিনে কিরে ব্যাটা? জুতিয়ে লাল করে দেব। এখুনি যা - দেখিস পথে মেলা দেরি করিস নে।' হনুমান ওষুধ আনতে কৈলাসের দিকে রওনা দিলে সকলে মিলে আহত লক্ষ্মণকে পাহারা দেবার জন্য বিভীষণকে সেনাপতি নিযুক্ত করল। যম কিংবা যমদূতের সঙ্গে সাক্ষৎ হলে যে কী ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটবে তা আশঙ্কা করে বিভীষণ করুণ সংগীত ধরে —

"শুন দেবাসুর গন্ধর্ব কিন্নর —
মানব দানব রাক্ষস বানর।
শুন সর্বজনে মোর মৃত্যু হলে
শোকসভা করো তোমরা সকলে।"

চতুর্থ দৃশ্যটি মূলত উপসংহার। লক্ষ্মণের আরোগ্য লাভ এবং নাটকের পুরো ঘটনাটির কৃতিত্ব নেবার জন্য সকলের হাস্যকর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি। লক্ষ্মণকে যমালয়ে নিতে এলে যমদূতে দুজনের সঙ্গে বিভীষণের বিরোধ বাধে। এমন কী স্বয়ং যমরাজ যখন বিভীষণকে শাস্তি দিতে উদ্যত তখন 'পাহাড় লইয়া হনুমানের প্রবেশ' এবং সেই পাহাড় যমরাজের মাথার উপর স্থাপন। পাহাড়ের তলায় যম্‌রাজকে চাপা পড়তে দেখতে যমদূতরা 'হায় হায়' করে ওঠে। কেননা তাদের 'মাইনা' কে দেবে? যমরাজকে জাগাতে তারা যে গান ধরে, তা শুনে বিরক্ত হনুমান যমদূতদের গলাধাক্কা দিয়ে বলে - 'ভাগ! ভাগ! - ব্যাটারা গান ধরেছে যেন কুকুরের লড়াই বেঁধেছে।' শেষ পর্যন্ত হনুমানের আনা ওষুধ খেয়ে লক্ষ্মণ সুস্থ হলে হনুমান বলে '... ওষুধ এনে বাহাদুরিটা নিয়েছি।' শুরু হয় বাহাদুরি নেবার জন্য হনুমান, বিভীষণ, সুগ্রীব, জাম্বুবান, রামের মধ্যে বাদানুবাদ। এমনকী লক্ষ্মণ পর্যন্ত বলে — 'আর আমি যদি শক্তিশেল খেয়ে না পড়তাম তবে তো এ-সব কাণ্ডকারখানা কিছুই হত না - আর তোমরাও বিদ্যা জাহির করতে পারবে না।"

নাটকটির সমাপ্তি ঘটেছে রূপকথার অন্তিমে থাকা সেই চিরায়ত 'নটে গাছটি মুড়ালো' ছড়াটির মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ নাট্যকার যেন সবাইকে জানিয়েই দিলেন, এই রামায়ণ পৌরাণিক বৃত্তের বাইরে রূপকথা জগতের। বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপের ও চরিত্রের পুনর্নির্মাণ তাঁর এই নাটককে এক আশ্চর্য ফ্যান্টাসির জগতে পৌঁছেদিয়েছে। রামায়ণের পৌরষদীপ্ত চরিত্রগুলি সুকুমারের হাতে একধরনের 'টাইপ ক্যারেক্টার' হয়ে উঠেছে। চরিত্রের এই উলটপুরাণ 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'কে অনন্য করে তুলেছে।

'ননসেন্স ক্লাব' এর প্রয়োজনেই ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে সুকুমার 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' ছাড়াও লেখেন তাঁর বিখ্যাত নাটক 'ঝালাপালা'। নাটকটির উপর ননসেন্সক্লাবের মৌরসী পাট্টা বোঝাতে সুকুমার 'ঝালাপালা'র ভূমিকায় লেখেন —

> *" - এই নাটক ননসেন্স ক্লাবের স্থাবর সম্পত্তি। যে কেহ এই নাটক উক্ত নন্‌সেন্স ক্লাবের বিনা অনুমতিতে আত্মসাৎ করিবে বা করিতে চেষ্টা করিবে অথবা এই নাটকের বা ইহার অংশ বিশেষের কোনরূপ তর্জ্জমা, নকল বা কোনও প্রকার অনুকরণ করিবে, বা করিতে চেষ্টা করিবে, অথবা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিবে, কিম্বা অপর কাহাকেও উক্ত প্রকার দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত, উৎসাহিত বা সাহায্য করিবে, তাহারা এবং সাহায্যকারী অন্তরঙ্গ ইয়ারবর্গকে, বিশেষ প্রকারে উত্তম মধ্যম অধম এবং বেদম দমাদম দেওয়ার বন্দোবস্ত উক্ত ননসেন্স ক্লাব কর্তৃক অচিরাৎ করা যাইবে।"*

নাটকটিতে ঝিঙেটোলার জমিদার চণ্ডীবাবুর ভালো মানুষীর সুযোগ নিয়ে, তাকে অনেকেই ভুলিয়ে - ভালিয়ে কাজ আদায় করে নেয়। এদের মধ্যে আছে এক পণ্ডিত মশাই, যিনি জমিদারের চন্ডীমণ্ডপে টোল খুলতে চান। আছে কেবলরাম নামের এক 'দুর্ধর্ষ' গায়ক। তাছাড়া দুলিরাম আর খেঁটুরাম নামে মোসাহেবদের হাত থেকে জমিদার মশাই তার মামার সাহায্যে যেভাবে নিস্তার পেলেন, তাই নিয়েই এই মজার নাটক। 'ঝালাপালা' তিনটি দৃশ্যে বিন্যস্ত। নাটকের শুরুতেই আছে জুড়ির গান —

'সখের প্রাণ গড়ের মাঠ
ছাত্র দুটি করে পাঠ
পড়ায় নাই রে মন
সবাই হচ্ছে জ্বালাতন!
অতিডেপো দুকান কাটা
ছাত্রদুটি বেজায় জ্যাঠা।

এই জ্যাঠা ছাত্রদুটি হল ঘটিরাম ও কেষ্টা। এছাড়াও আরও সাতটি চরিত্র আছে নাটকে। তারাই এই নাটকে গান গেয়ে ঘটনাগুলিকে গ্রথিত করেছে।

ভঙ্গুর জমিদারতন্ত্রে মোসাহেব ও চাটুকাদের দোহনবৃত্তির চেনাছবি ফুটে উঠেছে এই নাটকে। তবে ভীষ্মলোচন শর্ম্মার মতো কেবলচাঁদ নামের সাংঘাতিক গায়কের অবিভার্বে এই নাটক বেশ মজাদার হয়ে উঠেছে। যার গান শুনে নাটকের অন্যান্য চরিত্ররা মন্তব্য করেছে —

"পন্ডিত— যা না গাইলেন! গলা শুনলে ছত্রিশ রাগিনী ছুটে পালায়।
দুলিরাম - ওর পেটের মধ্যে ডুবুরি নামালে, গানের গ'টা মেলে কিনা সন্দেহ!"

ভারতবর্ষের চারিত্রিক অবনতি এবং ভারতবর্ষীয়দের অধঃপতন নিয়ে লেখা তার গানগুলি বিচিত্র হলেও মনে সামান্য চিন্তা জাগিয়ে তোলে।

দুলিরাম ও খেঁটুরাম নামে দুই মোসাহেব জমিদার চণ্ডীবাবুকে ভুজুংভাজুং বুঝিয়ে জাঁকিয়ে বসতে চায় সেখানে। শেষ পর্যন্ত চণ্ডীবাবুর কেদারমামার তলব হয়। উকিলমামার কেরামতিতে মোসাহেবদের কবল থেকে উদ্ধার পেলেন তিনি। নাটকের শেষে কেদার মামার উপলব্ধি — ' বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য - মানুষ চেনা চাই! ঠিক লক্ষ্মণ দেখে ওষুধ দিতে হয় '

'মোসাহেবতন্ত্রের প্রতি ব্যঙ্গদ্রিপের পাশাপাশি এই নাটকে সুকুমার প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিও কটাক্ষ করেছেন। আছে ছাত্র - শিক্ষক সম্পর্কের গলদ নিয়ে ঠাট্টা। এই নাটকে এমনই এক সুবিধাবাদী পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটেছে। যার লক্ষ্য যেনতেনভাবে জমিদার মশায়ের বাড়িতে একটা টোল খোলা। তার অঙ্ক এবং ইংরাজীতে জ্ঞান ভয়াবহ। ব্যঙ্গচ্ছলেই সুকুমার পণ্ডিতমশায়ের বিদ্যার নমুনা উপস্থিত করেছেন। তার গুণধর ছাত্র কেষ্টা 'আই গো আপ্, ইউগো ডাউন' এই ইংরাজী বাক্যটির মানে জিজ্ঞেস করলে পন্ডিতমশায় বলেন —

> *''আই' — 'আই' কিনা চক্ষু:, 'গো' — গয়ে ওকারে গো - গৌ গাবৌ গাব:, ইত্যমর:। 'আপ' কিনা আপ: - সলিলং বারি অর্থাৎ জল। গোরুর চক্ষে জল, অর্থাৎ কিনা গোরু কাঁদিতেছে। কেন কান্দিতেছে? না উই গো ডাউন,' কিনা 'উই' অর্থাৎ যাকে বলে উইপোকা - 'গো ডাউন,' অর্থাৎ গুদামখানা। গুদামঘরে উই ধরে আর কিছু রাখলে না, তাই না দেখে, 'আই গো আপ' - গোরু কেবলি কান্দিতেছে-''*

গুরুমশায়ের এই চমৎকার জ্ঞানপ্রতিভা সম্পর্কে ছাত্ররাও ওয়াকিবহাল, এবং তা নিয়ে তারা গুরু মশায়কে নাকাল করতেও ছাড়ে না। কিন্তু তবুও গুরুবাদকেন্দ্রিক বিদ্যাশিক্ষার গতিপ্রকৃতি বদলায় না বিন্দুমাত্র।

সুকুমার ছোটদের জন্য যে সাহিত্যভুবন নির্মাণ করেছেন, সেখানে তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভা তাঁকে সার্থক রসস্রষ্টা করে তুলেছে। ছোটরা তাঁর লেখা পড়ে হেসে খুন হয়, আর বড়োরা সবিস্ময়ে লক্ষ করেন সুকুমারে শ্লেষ ও শব্দ প্রয়োগ। প্রচলিত সমাজ ও শাসন ব্যবস্থার প্রতি তাঁর শানিত বিদ্রুপ বড়োদের আত্মপোলব্ধিতে বাধ্য করে। একই লেখার এই দ্বিবিধ আবেদন বাংলা সাহিত্যে বিরল। সুকুমার সেই বিরল সাহিত্যের স্রষ্টা বলেই তিনি ছোটদের সাহিত্য জগতের পাশাপাশি বড়োদের সাহিত্য জগতেও পৌঁছে গেছেন।

সুনির্মল বসু (১৯০২ - ১৯৫৭)

(১)

সুকুমার পরবর্তী বাংলা শিশুসাহিত্যের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সুনির্মল বসু (১৯০২-১৯৫৭) । কবিরূপে তাঁর জনপ্রিয়তা প্রশ্নতীত। তাঁর ছোটগল্প ও নাটক সমধিক জনপ্রিয় করেছিল তাঁকে। পাশাপাশি চিত্র অলঙ্করণ এবং সম্পাদনাতেও তিনি দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। সুনির্মল বসুর জন্ম

৪ঠা শ্রাবণ, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ (২০ জুলাই, ১৯০২)। গিরিডির পশুপতি বসুর মধ্যম সন্তান সুনির্মল শৈশব থেকে সাংস্কৃতিক আবহে মানুষ হয়েছেন। তাঁর মাতামহ ছিলেন প্রখ্যাত বিপ্লবী— সাহিত্যিক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ('আশাপ্রদীপ' ও 'কুম্ভমেলা' গ্রন্থ প্রণেতা)। পিতামহ গিরিশচন্দ্র ছিলেন সেযুগের দারোগাদের রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কথাকার। লিখেছেন 'সেকালের দারোগার কাহিনি'। অভ্রব্যবসায়ী সুনির্মলের পিতা পশুপতির সংগ্রহে ছিল সেকালের কিছু মূল্যবান বই। ছেলেবেলা থেকেই পিতৃ ও মাতৃকুলের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে হাতের কাছে পেয়েছেন নানা ধরনের বই। বিদ্যালয় শিক্ষা শুরুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হাসিখুশি, হিতোপদেশ, পদ্যমালা, মোহনভোগ, রাজকাহিনি, রাঙাচুরি, কৃত্তিবাসী রামায়ণ - প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে প্রাণভরে কাহিনির রস আহরণ করেন। এর সঙ্গে যোগ হয় বিভিন্ন সাহিত্য পত্রের রচনা সম্ভার। 'নারায়ণ', 'মর্মবাণী', 'গৃহস্থ', প্রভৃতি পত্রিকা ছিল তাঁর বাল্যসহচর। তবে তাঁর সবথেকে প্রিয় ছিল উপেন্দ্রকিশোর সম্পাদিত 'সন্দেশ'পত্রিকা। পরে একটি লেখায় তিনি জানিয়েছেন —

> *"বাড়ি ফিরে এসে সন্দেশের মধ্যে ডুবে গেলাম। আরে এতো অদ্ভুত বইয়ের কথাতো ধারণাই করতে পারি নাই, — কী সুন্দর ছবি, গল্প, কবিতা, ধাঁধা, আমায় যেন এক নতুন রাজ্যে নিয়ে গেল। এই সন্দেশ আমার জীবনে একটা রঙিন আনন্দময় যুগ নিয়ে এলে।"*

শৈশবে 'সন্দেশ' তাঁর মনে লেখক হবার ইচ্ছা জাগিয়েছিল। দেড় বছরের বড় দিদির উৎসাহে তিনি ছড়া কবিতা লিখে পাঠিয়ে দিতেন 'সন্দেশ' পত্রিকায়। কিন্তু লেখা নির্বাচিত হলো না। ফলে জন্ম হল হাতে লেখা পত্রিকা 'অমৃত'। এখানেই লেখক হিসাবে প্রথম প্রকাশ সুনির্মলের।

'মাস্টার-শাসনতন্ত্রে' বেড়ে ওঠা সুনির্মল সে সময়ে পড়াশুনার ক্লান্তিকর জগৎ থেকে অবসর পেলেই বেড়িয়ে পড়তেন বন্ধুদের নিয়ে। তাদের উদ্যেগে প্রকাশিত হল হাতে লেখা পত্রিকা 'অবকাশ রঞ্জন'। সুনির্মল ভূমিকায় লিখলেন —

অবকাশরঞ্জন বিপদের ভঞ্জন,
রঞ্জিত করে চারিধার,
মাভৈঃ মাভৈঃ রব করে নর-নরী সব,
খঞ্জন গাহে অনিবার।

এরপর ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরে চার বন্ধু (সুনির্মল, বসন্তকুমার দত্ত, অজিত কুমার নাগ ও সুশীল কুমার নাগ) মিলে প্রকাশ করলেন হাতে লেখা পত্রিকা 'আশা'। পড়াশুনার কারণে কোলকাতার সেণ্ট পলস কলেজে ভর্তি হওয়ার পর গিরিডির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়।

এইসময় তিনি লেখালেখিতে মনোনিবেশ করলেন। 'প্রবাসী'র ছেলেদের পাততাড়িতে প্রথমবার তাঁর লেখা ছাপা হল। শুরু হল শিশুসাহিত্যে তাঁর জয়যাত্রা। প্রথম কবিতার বই 'হাওয়ার

দোলা' প্রকাশিত হয় ১৯২৫ সালে। আর মৃত্যুর (১৯৫৭) আগে পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় পঞ্চান্ন। বাংলা শিশু সাহিত্যের বন্ধ্যা যুগে শিশুদের জন্য রচিত এই বিপুল গ্রন্থসম্ভার সত্যিই চমকপ্রদ। সুনির্মলের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী, সংকলন গ্রন্থ :

ছড়া ও কবিতার বই: হাওয়ার দোলা (১৯২৫), হুলস্থূল (১৯২৮), তালপাড় (১৯২৯), কবিতা মঞ্জরী (১৯২৯), টুনটুনির গান (১৯৩০), হট্টগোল (১৯৩২), হাসিকান্নার দেশে (১৯৩৪), জানোয়ারের ছড়া (১৯৪৮), কিশোর আবৃত্তি (১৯৫০), ছড়ার ছবি (৫০-৫৩), রঙিন হাসি (১৯৫১) , আমার ছড়া (১৯৫২), ছড়া ছবিতে জানোয়ার (১৯৫২), মনের মত বই (১৯৫৫), হুল্লোড় (১৯৫৭। **গল্পের বই :** সব ভুতুড়ে (১৯৩৩), হাসি মুখ (১৯৩৩), কণাকড়ির খাতা (১৯৩৪), দিল্লী কা লাড্ডু (১৯৩৪), মরণ ফাঁদ (১৯৩৫), মরণের ডাক (১৯৩৬), লালন ফকিরের (১৯৩৬), নিঝুম পুরের স্বপনকথা (১৯৩৯), রাঙামামার ভাঙা আসর (১৯৩৯), অসম্ভব দুনিয়ায় (১৯৩৭), গুজবের জন্ম (১৯৩৯), মিহিদানা (১৯৩৪),হাসিকান্না (১৯৩৪), মরণের মুখে (১৯৩৫), জীবন্ত কঙ্কাল (১৯৩৬) , আদিম দ্বীপে (১৯৪০), কেউটের ছোবল (১৯৪২), ইণ্টি বিণ্টির আসর (১৯৫০), সোজা বই (১৯৫০), ছোটদের পদ্ম পুরাণ (১৯৫২), শ্রেষ্ঠ গল্প সংগ্রহ (১৯৭৫), শহুরে মামা ও কানাকঁড়ি (১৯৮৩), অল্প কথায় গল্প, রোমাঞ্চকর অঞ্চলে, রোমাঞ্চের দেশে, হারু সর্দারের বাঘ শিকার। **ছন্দ শিক্ষার বই :** ছন্দের টুংটাং (১৯২৯), ছন্দ ঝুমঝুমি (১৯৩২),ছোটদের কবিতা (১৯৫১), ছন্দের গোপন কথা (১৯৫৬), ছোটদের নাটক—কিপটে ঠাকুরদা (১৯৬৩), বীর শিকারী (১৯৩৩), তেপান্তরের মাঠ (১৯৫৫), শিশুনাট্য (১৯৫৫), আনন্দনাড়ু (১৯৫৭), শহুরে মামা(১৯৫৭), বন্দী বীর (১৯৬০)।

শিশুসাহিত্যের জন্য সুনির্মল ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। তাঁর ভাগিনেয় সাহিত্যিক শ্রী বুদ্ধদেব গুহ এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—'অমন নিবেদিত শিশু সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্য জগতে আর এসেছেন বলে জানিনা।' ছোটদের জগৎকে জীবনের ধ্রুবতারা করেছিলেন বলেই তিনি ছোটোদের রাজ্যে অসম্ভব জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয়তা একদিকে যেমন তাঁর কৌতুকময় সরস কাহিনির জন্য, অন্যদিকে সহজ সরল অনাবিল ভাষা তাকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। তাই কবি, ছড়াকার, গল্পলেখক, নাট্যকাররূপে তিনি অনায়াসে পাঠকের হৃদয়ে ঠাঁই করে নিয়েছেন।

(২)

সুনির্মল মোট আঠাশটি গল্পগ্রন্থ লিখেছেন। রূপকথা, শিকার, মানবিক মূল্যবোধ, হাস্যকৌতুক—সবমিলিয়ে তার গল্পের বিষয় ছিল বিচিত্র। সুনির্মল হাসির গল্পের জন্য বিখ্যাত। সময় ও সমাজ বর্হিভূত অর্থহীন আজগুবি জগৎ তৈরি করেননি তিনি। বরং তাঁর গল্পগুলি চেনা মানুষের গল্প। মানুষের সাধারণ ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি হাস্যরসের সাহায্যে পরিবেশন করেছেন। সামাজিক ত্রুটি বিচ্যুতিও তাঁর নজর এড়ায় নি। বরং হাসির কথা বলতে বলতে তিনি সচেতন করেন পাঠককে। 'কীর্তিপদের কীর্তি' গল্পে 'ডিণ্ডিম' নামে একটি দৈনিক সংবাদপত্রের ব্যবসা

বাড়ানোর উদ্দেশ্যে প্রচার করা মিথ্যা সংবাদ পাঠকের মধ্যে হুলস্থূল বাধিয়ে দেয়। এক পয়সার 'ডিণ্ডিম' মুহূর্তে বিক্রিয় হয় চার পয়সায়। পরে খবর ওলটপালট হওয়ার দোষ প্রেসের ঘাড়ে চাপিয়ে 'অনিচ্ছাকৃত অপরাধ' স্খালনের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করা হয়। এইভাবে নির্মল হাসির অন্তরালে গণমাধ্যমের অপপ্রয়োগ সম্পর্কে তিনি সচেতন করতে চেয়েছেন পাঠকদের।

এই ধরণের আরেকটি গল্প 'গুজবের জন্ম'। গুজব যে কত ভয়াবহও সর্বনাশা হতে পারে, তারই ভয়ঙ্কর বর্ণনা রয়েছে এই গল্পে। বাড়ির কাজের লোক কেষ্টা, বাবুর তামাক জ্বালতে গিয়ে টিকের আগুনে বৈঠকখানার দামী ফরাসের সামান্য একটু খানি পুড়িয়ে ফেলেছিল। সে কথাই সে আক্ষেপ করে বলেছিল বাড়ির কাজের মহিলাকে। ক্রমে সেই খবর অতিরঞ্জিত হয়ে শহরজুড়ে পল্লবিত হয়েছে। অফিস থেকে মনিব যখন ফিরছিল, তখন পথে কবিরাজ তাঁকে দেখে অবাক। বলল— 'এই শুনছিলাম করিম গয়লার কাছে, যে তোমার চাকর কেষ্টা, কালরাত্রে ডাকাতের দলে যোগ দিয়ে তোমার জিনিসপত্তর, ঘরবাড়ি, মায় তোমাকে শুদ্ধ পুড়িয়ে মেরেছে। সে স্বচক্ষে দেখে এসেছে'। বাড়ি ফিরে বাবু তাজ্জব - গোটাবাড়িতে লোক ভর্তি। কেষ্টাকে হাতে নাতে পাকড়াও করে পুলিশ বেঁধে ফেলেছে। একটি মিথ্যা গুজবের এই ক্রমিক বিস্তার একদিকে যেমন কৌতুক সৃষ্টিকারী তেমনি কেষ্টার অপদস্থ হওয়ার ঘটনায় সমাজজীবনের উপর গুজবের ক্ষতিকর প্রভাবের দিকটি তুলে ধরেছে।

সেয়ানে সেয়ানে টক্কর নেওয়ার গল্প 'আগডুম বাগডুম'। আজগুবি নগরের আগডুম ছিল পাকাচোর আর অবুঝ নগরের বাগডুম ছিল ডাকসাইটে ঠগ। প্রথমবার তাদের সাক্ষাতে আগডুম হাঁড়িতে পচা গোবর ঠেসে বাগডুমকে বিক্রি করে, বিনিময়ে পায় খাপে ঢাকা সুন্দর একটি তলোয়ার। বাড়ি গিয়ে দেখা যায় তলোয়ারের জায়গায় একটা সরু লিকলিকে কাঠি। শোধ নিতে আগডুম কিছু পচা ডিম নিয়ে বাগডুমের কাছে এল 'দুধ হাঁসের টাটকা তাজা ডিম' বেচতে। সাদরে গ্রহণ করে আগডুম বললে অন্ধকার ঘরের কোণে রাখা টাকার থলি নিয়ে যেতে। টাকার বদলে ছিল সেখানে মস্ত ভিমরুলের চাক। হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বড়ো বড়ো ভিমরুল চারদিক থেকে এসে তাকে এমন কামড় দিতে লাগল যে, 'আগডুম প্রাণের দায়ে একেবারে পগার পার।'

তাঁর গল্পে বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 'কুট্টিমামার আবিষ্কার' গল্পের কুট্টিমামা অনবদ্য। কুট্টিমামা প্রফেসর শঙ্কুর মতো বিজ্ঞানী। তিনি সেতার দিয়ে পাঁচন তৈরি করেন, হুঁকোর খোলে নলচের বদলে একটা বাঁশি বসিয়ে তৈরি করেন 'তালবোলা', যাতে হুঁকোও খাওয়া যায়, বাঁশিও বাজানো যায়। চোর ধরার জন্য তৈরি তাঁর বিশেষ কল পাতা হয় বাড়ির চতুর্দিকে তার ছড়িয়ে, চোর ঢুকতে গেলেই চার দিকে বেজে উঠবে অ্যালার্ম। তবে তাঁর সবচেয়ে আজব আবিষ্কার হল 'দাঁড়মোনিয়াম'। আটটি দাঁড়কাক পাশাপাশি খাঁচায় বন্দী, স্প্রিং-এর ক্লিপ দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ। ক্লিপে শিকল লাগানো আছে, এক একটি শিকল টানলেই এক-একটির মুখ খুলে যায়, শুরু হয় এক-এক স্কেলে চিৎকার। এই দিয়ে কুট্টিমামা রোজ বিচিত্র সুরে ভৈরবী বাজাতেন।

সেই পিলে চমকানো চিৎকার যে সাঙ্গীতিক আতঙ্কের জন্ম দিত তা আমাদের মনে করিয়ে দেয় সুকুমারের ভীষ্মলোচন শর্মাকে। 'চোরধরা' গল্পে নারকেল চুরি করতে নারকেল গাছে ওঠা চোর আত্মরক্ষা করার জন্য একের পর এক নারকেল পুকুরের জলে ফেলে। আঘাত পাওয়ার ভয়ে চোরধরার দল নারকেল শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে। নারকেল পড়ার শব্দ বন্ধ হলে দেখা যায় গাছের উপর চোর নেই। অন্ধকার রাতে নারকেল ফেলতে ফেলতে নিজেই কখন ঝাঁপ দিয়ে চোর পালিয়ে গেছে। কাব্যরোগের টোটকা' গল্পে অভিরামের 'কাব্যরোগ' সারাতে কবিরাজ তর্কচঞ্চু যে উপায় বাতলেছেন তা যেমন বিচিত্র, তেমনি অদ্ভুত। ফলে 'এক সপ্তাহ পরে অভিরাম গেল বিলকুল সেরে।'

'কবি' রোগ যে কত মারাত্মক - তার আরেকটি দৃষ্টান্ত ঘাটালের কানাকড়ি। খেলনা তীর ধনুক নিয়ে অনুশীলনের সময় তার হাতে দৈবাৎ একটি কাঠবেড়ালীর মৃত্যু হয়। মনের দুঃখে সে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'র অনুকরণে লিখে ফেলেছিল 'কাঠবিড়ালিবধ কাব্য'। কবিবর কানাকড়ি কাব্যরচনার অনাবিল স্বাদ পেয়ে আনন্দে উদবেল হয়ে ওঠে। হাতের সামনে যে বই সে পেয়েছে, তারই অনুকরণে মেতে উঠেছে। তার হাত থেকে রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর—কেউ রক্ষা পায়নি। রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি'র অনুকরণে কবিতা লিখেছে সে। কবি কানাকড়ির প্রতিভার কদর নেই কারও কাছে। বরং সকলে তাকে এড়িয়ে চলতে চায়। ছোটবোন নেড়ি একমাত্র তার কবিতার সমঝদার। সেই নেড়িও বিয়েরপর শ্বশুরবাড়ি চলল। নেড়ি বিয়ের পর দাদাকে ছেড়ে যেতে চায়নি। খুব কেঁদেছিল। বোনকে বিদায় জানিয়ে কানাকড়ি লিখেছে অশ্রুসজল একটি বিরহসূচক কবিতা—

নেড়ির শ্বশুর —
চেহারাটা কদাকার - স্বভাব পশুর —
নেড়ি কাঁদাকাটি করে
নিয়ে গেল তারে ধরে,—
সীতারে হরিল যেন রাবণ-অসুর।

স্বভাবকবি কানাকড়ি। 'কবিরোগ' তাকে সকলের কাছে হাসির খোরাক করে তুলেছে। তৎসত্ত্বেও পুকুরে স্নান করতে যাওয়ার পথে মোষের গুঁতো খেয়ে আবেগ-উচ্ছ্বাসে সে লেখে—

ওরে ও মহিষ,
শিং নেড়ে তেড়ে এলি
গুঁতিয়ে কি সুখ পেলি —
বল দেখি কেন তুই
রাগিয়া রহিস?

এই কবিতা তার 'দুঃস্বভাব কবি' প্রতিভার স্বাক্ষরবহনকারী। শুধু কানাকড়িই নয়, বহু অক্ষম কবিই সুনির্মলের হাস্যরসের উপকরণ। 'কবি ধুরন্ধর', 'ঝিমন্ত সিংহ' গল্পে কবিদের আচার-আচরণ-দুর্বোধ্য-সৃষ্টিছাড়া রচনা, পাঠককে মোহিত করে রাখে।

হাসির গল্পের তিনি সুচারু শিল্পী। কিন্তু রূপকথার গল্প রচনাতেও তিনি সমান পারদর্শী। শুভ ও অশুভর সংঘাতে অশুভর পরাজয় নিশ্চিত — এই বার্তা তিনি সহজেই পৌঁছে দেন শিশুদের কাছে। শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে এক লালিত্যময় ভাষায় তিনি রূপকথার জগৎ তৈরি করেন। রূপকথার ধারা অনুসারে তাঁর গল্পে গদ্যের মাঝে মাঝে উঁকিদেয় পদ্য। 'হিংসুটে রাণীর কীর্তি', 'বাঁদর রাজপুত্র', 'রাজার মেয়ে চম্পাবতী', 'রাজপুত্র ও উজীরপুত্র' শিশুদের রূপকথার রাজ্যে নিয়ে চলে।

প্রচলিত রূপকথার কাহিনি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন সুনির্মল। 'হিংসুটে রাণীর কীর্তি'তে সন্ন্যাসীর বরে ছোটো রাণীর ছেলে হল, অন্য রাণীরা হিংসে করে সে ছেলে বনে ফেলে দিয়ে ছোটো রাণীর পাশে দিয়ে গেল কাঠের পুতুল। পরে সন্ন্যাসীই সে ছেলে রাজাকে ফেরত দিলে রাজার সম্বিত ফিরল। 'বাঁদর রাজপুত্র' গল্পে। বড়ো রাণীর দুঃখের শেষ নেই, একটি বাঁদর প্রতিপালন করেই তাঁর দিন কাটে। এই বাঁদর রাজকুমারই রাণীর দুঃখ ঘোচাল। 'রাজার মেয়ে চম্পাবতী' গল্পে বোন চম্পাকে দুঃসাধ্য সাধন করে উদ্ধার করে ছোটো রাজকুমার আশিস, কিন্তু সে কৃতিত্ব দাবি করে বাকি দু-ভাই। শেষে অবশ্য সত্যেরই জয় হয় এবং আশিসকুমারের ভাগ্যেই জোটে রাজকুমারী। সুনির্মলের রূপকথা প্রচলিত রূপকথার ফর্ম অনুযায়ী লেখা হয় না। কিন্তু তবুও রূপকথার শুভঙ্করী দিকটি দেখিয়ে তিনি লৌকিক কাহিনির পুনর্নির্মাণ করে, ছোটদের রাজা-রাজপুত্র, রাণীর জগতে নিয়ে গেছেন।

প্রচলিত আঙ্গিক অনুযায়ী সুনির্মল রূপকথার নিটোল গদ্যের মধ্যে মাঝে মাঝে ছড়ার ব্যবহার করেছেন। এই ব্যবহার যেমন কাব্যিক, তেমনি কাহিনি বিন্যাসের একান্ত সহযোগী। 'রাজপুত্র ও উজিরপুত্র গল্পে এইরকম একটি ছড়ার দৃষ্টান্ত ঃ

দেউড়ির ধারে আছে
ডালিমের ফুল,
রাক্ষসীর প্রাণ তাতে,
নাহি কিছু ভুল।
সেই ফুল ছিঁড়ে নিয়ে
করো ছারখার;
রাক্ষসী মরিবে, হবে
মোদের উদ্ধার।

সুনির্মলের গল্পে রয়েছে রূপকথার নানা মোটিফ। 'ডালিমের ফুল', 'কাঠের পুতুল', 'বাদঁর', 'রাক্ষসী', এই ধরণের চেনা মোটিফ ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর রূপকথাতে।

অবক্ষয়িত সমাজে শিশুদের নৈতিক জগৎকে মূল্যবোধে উজ্জীবিত করতে তিনি কিছু মানবিক মূল্যবোধের গল্পও লিখেছেন। 'রাঙাশাড়ি' গল্পে ছোট্ট মেয়ে টুনি জলে ডুবন্ত একটি মেয়েকে রক্ষা করে। অথবা 'হরিবাবু' গল্পে নায়েব হরিবাবুর মৃত্যুর পরও জমিদারের কাছে টাকা পৌঁছে দেওয়ার দৃষ্টান্ত ক্ষুদ্র পাঠকদের মহত্তর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে।

সুনির্মল বসু শিকারের গল্প লিখেছেন যেমন—'বাঘে-মানুষে', 'সুন্দর বনে সুন্দর নিং' প্রভৃতি। জঙ্গলের গল্পে সত্যিকারের রোমাঞ্চ আছে 'অলৌকিক আস্তানা' গল্পে, যেখানে বিপদের ত্রাতা হিসাবে শের বাহাদুর নামে একটি বাঘ এসে হাজির হবে এবং বিপন্নকে বাঁচিয়ে দেবে। বাহদুর নামে এই রকম একটি পোষা হাতির সন্ধান মেলে 'বাহাদুরের বাহাদুরি' গল্পে—প্রাক্তন মনিব ডাকাতের হাতে পড়লে সে অতর্কিতে কোথা থেকে ছুটে এসে রক্ষা করে মনিবকে।

সুনির্মলের গল্পভুবন ছোটদের জন্য নিবেদিত। বড়োদের জটিল জীবনযাত্রার ক্লান্তি ও ক্লেদ সেখানে অনুপস্থিত। সমাজজীবনেব মধ্যে থেকেও সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা আভাষে ইঙ্গিতে জানালেও তিনি মুখ্যত শিশু-উপযোগী নির্মল কৌতুকরসের ভাণ্ডারী। এই কারণেই তার গল্পের ভাষা সহজ-সরল। জটিল ব্যক্যবন্ধের পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত বাক্যব্যবহার করেছেন তিনি। প্রয়োজনে সুকুমারের রায়ের মতো অদ্ভুত সব জোড়কলম শব্দ সৃষ্টি করেছেন। গজ আর গণ্ডার মিলে গজণ্ডার , সন্দেশ ও কেকের সংমিশ্রণে 'সংকেক', মালাই আর পুডিং মিলে যে 'মালাই'ডিং' তা একান্ত ভাবেই সুনির্মলের সৃষ্টি। এইভাবে কাহিনি বয়নে, শব্দ চয়ণে, কথকতার ঢংয়ে সুনির্মল ছোটদের মনের কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন বলেই তিনি ছোটদের গল্পে অনন্য-অদ্বিতীয়।

(৩)

কবি সুনির্মলের কাব্যের প্রেরণা প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছিলেন —

> *"আমার এই কাব্যজীবনের মূল উৎস হচ্ছে, আমার সেই বাল্যজীবনের মা-ঠাকুমার মুখে শোনা মধু ঝরানো সুরেলা ছড়াগুলি। সেই ছড়াগুলির কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।"*

তাই তাঁর ছড়ায় লোকায়ত জীবনের অনুরণন ঘটেছে। কখনও কখনও তিনি সরাসরি লৌকিক ছড়া ব্যবহার করেছেন তাঁর রচনায় যেমন—

উড়কি ধানের মুড়কি,
ইঁদুর চাটে গুড় কি?
টিক্‌টিকিটা বানায় বাড়ি,

ফড়িং ভাঙে সুরকি।
মৌমাছিরা মধুর লোভে
যাচ্ছে মধুপুর কি?

'বাল্যজীবনে' শোনা ছড়াগুলি তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে ছড়ায় লোকজ উপকরণ ব্যবহারে। একটি দৃষ্টান্ত—

সোনার গাছে হিরের ঝাড়,
খোকার হাতে ক্ষীরের ভাঁড়।
ক্ষীরের ভিতর মশার ডিম,
আবছা ভোরে ঝাপসা হিম,
ছাতিমতলায় হাতির নাচ,
পিছল পথে হিজল গাছ।
বকশিপাড়ার খ্যাঁকশিয়াল—
আঁকশি নিয়ে যাচ্ছে কাল।
মুণ্ডু সবার ঘুরায় রে—
আমার ছড়া ফুরায় রে।

এই ছড়াগুলি শিশু মনে রূপকথা ও কৌতুকরসের যুগ্মবেণী সৃষ্টি করে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত।

ছোটদের জন্য কবিতাও লিখেছেন তিনি। তবে তা বয়স্ক লেখকের লেখা বিক্ষিপ্ত কবিতা নয়। তাঁর লেখা শিশুপাঠ্য কবিতায় ছোটদের মনের জগৎ উন্মোচিত হয়েছে। নিজের খেয়াল খুশি মতো তিনি যেসব কবিতা লিখেছেন তার মধ্যে বেশির ভাগই সরস কবিতা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি কাহিনিমূলক। ছিটেল পাগলাটে কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে সুনির্মলের কবিতার চরিত্ররা। 'বঙ্কুখুড়ো' কবিতায় রসিক বঙ্কুখুড়ো রাতদুপুরে দরজায় ধাক্কা মেরে ঘুম ভাঙান শুধু এই কথাটি জানতে — 'মিঠে তামাক কোথায় পাব বলতে পারিস মাণিক?' 'শেঠজি' কবিতায় কুকুরের ভয়ে শেঠজি পালানোর সময় তাঁকে আশ্বস্ত করতে বলা হয় চেয়ে বলে চেঁচামেচি-করা কুকুর কামড়ায় না, তখন শেঠজি বলেন, 'প্রবাদ জানে তুমি, হামি—/ কুত্তাতো আর তা জানে না,' গোলোকবাবু হঠাৎ ঢোল বাজাতে আরম্ভ করলে সবাই যখন কৌতূহলী হয়ে কারণ জানতে চায়, তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন তিনি যা খুশি তাই করবেন, 'তোমার তা কী ভেটকিলোচন!' ('আজব খেয়াল'), শীতের রাতে মাগুর মাছ হাঁড়ির মধ্যে ঠাণ্ডা জলে রাখা আছে ঠাণ্ডায় তাদের কষ্ট হবে বলে হাবু চুল্লি জ্বেলে হাঁড়ি তার ওপর বসিয়ে দেয়, (কোথায় গেল মাছ)। মজার মজার ঘটনা সহজ-স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত হয় এসব কবিতায়।

সুনির্মলের আজগুবি কবিতা সুকুমার রায়ের Nonsence verse এর সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ।

রামায়ণের রাবণ সুকুমারের ভীষ্মলোচনের মতো সংগীত চর্চা করেন। মা-মা-গা-ধা শুনে রাবণের মামা কালনেমী রাবণকে প্রহার করতে কসুর করেনা—

শ্রাবণ-সাঁঝে রাবণ রাজা দশমুণ্ড নেড়ে
তানপুরাটি বাগিয়ে ধরে গান জুড়েছেন তেড়ে
মনে তাঁহার ভাব জেগেছে, মানছে না আর বাধা,
বারে বারে গান গেয়ে যান 'রে-রে মা-মা গা-ধা';
শঙ্কা জাগে তান শুনে তাঁর, লঙ্কাপুরী কাঁপে, —
তাল-কানা সব রাক্ষসেরা পালায় লাফে-ঝাঁপে।
ধুম্রবর্ণ কুম্ভকর্ণ আঘোর ছিল ঘুমে, —
চমকে উঠে উলটে পড়ে খাটের থেকে ভূমে।

কবিতায় এই গল্প বলার ঝোঁক তাঁর কবি প্রাণনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর কবিতায় উঁকি দিয়েছে প্রকৃতিও। শরতের নীল আকাশ কিংবা বৃষ্টি ভেজা গ্রাম্য দিন সুনির্মলের কবিতায় যখন তখন উঁকি দেয় —

জল ছপছপ মাঠের পথে
কে চলে যায় ভাই
ভাবছি বসে ওর সাথে আজ
উধাও হয়ে যাই।
কলার বাগান পুকুরপাড়ে
জল উঠেছে তারই ধারে
ঝর্‌ঝুর্‌ঝুর্‌ বাঁশের ঝাড়ে
শুনছি অবিরল
আবার এল জল।

সুনির্মল ছোটদের কবিতায় ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কবিতা ও ছড়ার পঙ্‌ক্তিগুলি ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে তিনি কবিতার অবয়বে বিভিন্ন নক্‌শা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। ফলে ছাপার পর কখনও কপিতাটির চেহারা হয়েছে বরফির মতো, আবার কখনও বা আলপনাসদৃশ। বাংলায় ছোটদের কবিতায় সুনির্মলের আগে কেউ এইভাবে আকৃতি নিয়ে চর্চা করেননি। তাছাড়া প্রকৃতির রূপরঙ বর্ণনায়, অনুভবে-হৃদয়ের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে ঢেউ তুলতে অনায়াসে তিনি ব্যবহার করেছেন ছন্দকে —

ঝরে	*নাগকেশরের রেণু*	*ঝুর ঝুর ঝুর*
ওরে	*শিরশিরে হাওয়া বয়*	*ফুর ফুর ফুর!*

জ্বলে আসমানে লাল আলো জ্বল জ্বল জ্বল
ওরে দেখবি তো আয় আয় চল চল চল
তোরা ওঠ না পাগল
ঘরে খোল না আগল,
চল ঘর ছেড়ে যাই চলে দূর দূর দূর
ওরে ঝিরঝিরে হাওয়া বয় ফুর ফুর ফুর!
ওরে ঝুর ঝুর ঝুর।

কবিতার শব্দ নির্বাচনেও সুনির্মল সদা সতর্ক ছিলেন। কবিতাকে মনোগ্রাহী করে তোলার জন্য তিনি ধ্বণ্যাত্মক শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহার করেছেন —

ওরে ঝিরঝিরে হাওয়া বয় ফুর ফুর ফুর
চলে ফুর ফুর ফুর
দোলে বনমাধবী,
দোলে শ্বেতকরবী,
আসে সৌরভসুন্দর, ভুর ভুর ভুর।
ওরে ঝিরঝিরে হাওয়া বয়, ফুর ফুর ফুর।
দোলে তুলতুলে ফুলকলি দুল দুল দুল
কাঁপে টলটলে হিমকণা টুল টুল টুল।
জাগে নীল পাখিটি,
খোলে নীল আঁখিটি,
আজি বুকে তার বেজে ওঠে সুর সুর সুর।
ওরে ঝিরঝিরে হাওয়া বয় ফুর ফুর ফুর

ছন্দ নিয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তার সন্ধান মেলে 'ছন্দের টুংটাং' গ্রন্থে। ছোটদের শেখার জন্য বাংলা ভাষায় ছন্দশিক্ষার এই বই অদ্বিতীয়।

(৪)

"শিশুরা মধ্যে মধ্যে বিচিত্রানুষ্ঠান করে নাচ, গান, আবৃত্তি ইত্যাদির মাধ্যমে। এই আনন্দোৎসব আরও জমে ওঠে যদি তাতে ছোটো ছোটো মজাদার নাটিকার জোগান দেওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যেই আমি কতগুলো টুকরো টুকরো হাসির নক্‌শা লিখেছিলাম।" [৩৫]

শিশুদের বিচিত্রানুষ্ঠাণকে আকর্ষণীয় করে তোলা উদ্দেশ্য হলেও নাটকের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা (রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকে নক্ষত্র রায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তিনি) তাঁকে

নাট্য রচনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই ছোটদের জন্য তিনি মোট আঠারাখানি নাটক রচনা করেছেন। ১. দাদার কথা মিথ্যে নয় ২. বুদ্ধুভূতুম ৩. প্যাঁচা বাদুড় বোয়াল ৪. পবিত্তর মাসিমা ৫. আনন্দনাড়ু ৬. ত্রিরত্ন ৭. উদো বুধো আর মামা ৮. চঞ্চুচাঞ্চল্য ৯. লাভের গুড় পিঁপড়েয় খায় ১০. বারব্লোর ঠেলায় ১১. কাশির টোটকা ১২. ব্যস্তবাগীশ ১৩. মুশকিল আসান ১৪. আরশোলা ফড়িং টিকটিকি ১৫. কিপটে ঠাকুরদা ১৬. শহুরে মামা ১৭. বীর শিকারী ও ১৮. বন্দীবীর।

এই নাটকগুলির মধ্যে বেশকিছু নাটক ছিল মুখোশনাট্য। তিনি শিশুদের আকৃষ্ট করার জন্য মঞ্চে আলোর ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তীব্র ঘটনা প্রবাহ তাঁর নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে নাটকে আদ্যন্ত কৌতুকরসের উৎসার ঘটিয়েছেন তিনি। এই কারণে সুনির্মল তাঁর নাটক গুলিকে বলেছেন 'টুকরো টুকরো হাসির নক্‌শা।'

'দাদার কথা মিথ্যে নয়' নাটিকায় চরিত্র দুটি -নন্তু আর কমলা দিদি। তাদের দাদা বাকি বলেছে, নন্তু একটি গাধা আর কমলাদি প্যাঁচা। ফলে নন্তু ভাবতে শুরু করেছে তার কান দুটো গাধার কানের মতো লম্বা হয়ে গেছে। কমলি অনুভব করে, তার নাকটা কুঁচকে গেছে। সে যেন পরিণত হয়েছে ভূতুম প্যাঁচায়। অবশেষে তারা বুঝল তারা গাধাও নয়, প্যাঁচাও নয়, তারা সরল সুস্থ স্বাভাবিক ছেলে-মেয়ে। নাটকের শেষে নন্তু আর কমলি গান ধরেছে—

আমরা ছেলে আমরা মেয়ে
জন্তু হয়ে রইব না আর,
স্বাধীন দেশে আমরা সবাই
মানুষ হব সত্যি এবার।

'বুদ্ধুভূতুম' নাটকটি রূপকথার আঙ্গিকে লেখা। স্বর্ণকুমারও বর্ণকুমার নামে দুই রাজপুত্রের অত্যাচারে রাজ্যের লোকেরা অতিষ্ট। তাদের মা বড়োরাণী ও মেজোরাণীর জন্য রাজা তাদের শাসন করেন না। রাজা ছোটরাণীকে দেখতে পারেনা। ছোটরাণী থাকে কুঁড়ে ঘরে। তার দুই পুত্র - বুদ্ধু ও ভূতুম। প্রথমটি বাঁদর আর দ্বিতীয়টি প্যাঁচা। এদের প্রকৃত নাম আনন্দকুমার আর কল্যাণ কুমার। দিগ্‌নগরের রাজকন্যাকে পাওয়ার লোভে স্বর্ণকুমার ও বর্ণকুমার সাগর পাড়ের ডাইনি বুড়ির রাজ্যে গিয়ে বন্দী হয়। বুদ্ধ ও ভূতুম পরে সেখান থেকে তাদের শুধু উদ্ধারই করে না, সঙ্গে করে আনে সোনার গাছের হীরে মোতির ফুল। ফলে তাদের সঙ্গেই বিয়ে হল দুই রাজকন্যার।

হিংসা ভুলে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নাটক 'আনন্দনাড়ু'। নাটিকাটির শুরুতেই হিংসুটে এক মহিলা এসে হাজির হল এক ঝগড়াটি মেয়ের কাছে। হিংসুটি মেয়েটির বাড়ি ঈর্ষানদীর তীরে। ঝগড়াটি নারীর বাড়ি কোঁদলপুরে। তারা পরস্পরের মুখোমুখি হতেই শুরু হয়ে যায় ঝগড়া। একজন বলে, তার শাড়িটি ভালো, তার মুখটি সুন্দর। অমনি অন্যজন বলে, তার পটলচেরা নাক, হাঁসের মতো চলা। এইভাবে তারা একে অপরের খুঁত ধরে ঝগড়া শুরু করলে, সেখানে এসে

উপস্থিত হয় মিতালিসুন্দরী। তার বাড়ি আনন্দপুরে। মিতালিসুন্দরীর কাজ হল সবার মধ্যে মিতালি পাতিয়ে দেওয়া। মিতালির অসাধ্যসাধনায় দুজনে তাদের যাবতীয় ঈর্ষা ভুলে একে অপরের বন্ধু হল। এই অসাধ্য সাধনের পিছনে আছে আনন্দনাড়ু। মিতালিসুন্দরী তাদের খাইয়ে দিয়েছে আনন্দনাড়ু। মিতালিসুন্দরীরর বিশেষ অনুরোধে তারা একে অন্যের মুখে গুঁজে দিয়েছে আনন্দনাড়ু। তাদের নতুন নাম হয়েছে শান্তি আর তৃপ্তি। পারস্পরিক হিংসা-বিবাদের পরিবর্তে ভালোবাসার মন্ত্র শেখানোই এই নাটকের উদ্দেশ্য।

কিপটে ঠাকুরদা নাটিকাটি এক কৃপণ ঠাকুরদার কাহিনি। চোরাবাজারে চাল বেচে ঠাকুরদা যত টাকা জমিয়েছিলেন তা সবই জমা ছিল ঢন্টিরাম ব্যাংকে। পাড়ার একদল ছেলে ঠাকুরদার কাছে এসেছিল বনভোজনের জন্য চাঁদা চাইতে। ঠাকুরদা তাদের তাড়িয়ে দেন। প্রতিশোধ নিতে ছেলের দল বনভোজনের ব্যবস্থা করে কিপটে বুড়োর নামে ধারে জিনিসপত্র কিনে। ঠাকুরদার কাছে দোকানদার দাম চাইতে এলে তিনি তাদের তাড়িয়ে দেন। পাওনাদার শায়েস্তা করতে পারার আনন্দে যখন ঠাকুরদা নিশ্চিন্ত, তখনই তাঁর কাছে খবর আসে ঢন্টিরাম ব্যাংক ফেল করেছে। ফলে সর্বশান্ত হন ঠাকুরদা। তার করুণ বিষাদান্তক পরিণতি তৎকালীন ভারতবর্ষের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার দুরবস্থাকেই তুলে ধরেছে।

এছাড়াও তাঁর কৌতুক নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম 'চঞ্চুচাঞ্চল্য', 'লাভের গুড় পিঁপড়ে খায়', 'বারবেলার ঠেলায়', 'কাশির টোটকা', 'মুশকিল আসান' প্রভৃতি। 'চঞ্চুচাঞ্চল্যে' দুই নেকী পণ্ডিতের মিথ্যে পাণ্ডিত্যের বড়াই মুহূর্তেই চূর্ণ করে ছিদাম চাষী। 'লাভের গুড় পিঁপড়ে খায়' নাটকে বিরূপাক্ষ ব্যাটবল পথ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া ঘড়ি নিয়ে নাকানি-চোবানি খান। 'বারবেলার ঠেলায়' নাটকে বন্ধু জগা ও ভজা বারবেলায় খাবারের দোকানে ঢুকে হুলস্থূল বাঁধিয়ে দেয়। 'কাশির টোটকা' নাটকে হাবু বুদ্ধির জোরে ঠাকুরদার পিয়াজি ফুলরি আত্মসাৎ করেছিল।

সুনির্মলের 'বন্দীবীর' একটি ঐতিহাসিক নাটক। এই নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চন্দ্রগুপ্ত নাটকের প্রভাব রয়েছে। গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার এবং পুরুরাজের যুদ্ধ এই নাটকের বিষয়। পুরুরাজ আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি বন্দী হলে, পুরুরাজ সাহসিকতার সঙ্গে গ্রিকরাজের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দেন। অবশেষে আলেকজাণ্ডার পুরুরাজের সুগভীর দেশপ্রেম ও বীরত্বের পরিচয় পেয়ে সন্তুষ্ট হলেন। পুরুরাজের চারিত্রিক দৃঢ়তায় মুগ্ধ হয়ে আলেকজাণ্ডার তাঁকে মুক্তি দিলেন।

সুনির্মল শিশুদের আনন্দানুষ্ঠানের কথা ভেবেই স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটিকা লিখেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন, তাঁর নাটকগুলি 'হাসির নকশা'। আরশোলা ফড়িং টিকটিকি, প্যাঁচা বাদুড় বোয়াল, চঞ্চুচাঞ্চল্য, কাশির টোটকা নকশাগুলিরসংলাপ পদ্যে রচিত। এদের মধ্যে প্রথম দুটিকে মুখোস-নাট্য বলা যেতে পারে।

সুনির্মল বসুর নাটকের প্রধান সম্পদ গান। গানগুলি মজার 'বুদ্ধুভুতুম' নাটকে সঙের গানটি বেশ মজার—

আমরা কজন সং,
যেমনি মোদের মুখের গড়ন
তেমনি গায়ের রং;
আমরা কজন সং।
কাজের মধ্যে অষ্টরম্ভা
বাক্য কেবল লম্বা লম্বা —
যেমনি মোদের গলার ছিরি,
তেমনি চলার ঢং;
আমরা কজন সং।
দিগনগরের রাজ্যে আমরা
ছাগল পাঁঠা গাধা দামড়া
পাগল বলে কেউ বা মোদের
দেখে পোশাক জবরজং
আমরা কজন সং।

মজার গানের উপকরণরূপে তিনি 'আগমনী' গান ও ব্যবহার করেছেন 'ব্যস্তবাগীশ' নাটিকায় —

এসো মা আনন্দময়ী
নিরানন্দপুরে,
দশভুজার হবে পূজা
সারা বঙ্গ জুড়ে।
অভয়া বরদা মা যে
আছেন সদা হৃদয় মাঝে।
যার আছে চোখ দেখতে সে পায়
মরে না সে ঘুরে —
সন্তানেরে ফেলে মা কি
রহেন কভু দূরে?

শিশুদের ভালোমানুষ ও স্বাধীন দেশের সুনাগরিক হওয়ার আহ্বান রয়েছে তাঁর কিছু নাটকে। কৌতুক ও সামাজিক ত্রুটি বিচ্যুতির মিশেলে তাই তাঁর নাটকগুলি ছোটদের সামনে এক মহৎ আদর্শকে তুলে ধরেছে।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (১৯০৪-১৯৩৯)

(১)

বাংলা কিশোর সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার হয়ে ওঠার যাবতীয় প্রতিশ্রুতি ছিল মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের (১৯০৪-১৯৩৯)। কৌতুকরসের নির্ভেজাল রূপায়ণে তিনি রাজশেখর বসুর সমগোত্রীয়।

বিশেষতঃ পৌরাণিক কাহিনির পুনর্সৃজনের মধ্য দিয়ে রাজশেখর যে নির্মল হাস্যরসের সৃষ্টি করে পাঠকে সমাজে আদৃত; মনোরঞ্জন তাঁর ছোটদের জন্য লেখা গল্পগুলিতে সেই আমেজ ছড়িয়েছেন রাজশেখরের পূর্বেই। গোয়েন্দাগল্প লেখাতেও তিনি সমান পারদর্শী। লিখেছেন নাটক এবং ভৌতিক গল্প। সবক্ষেত্রেই কাহিনির প্লট নির্মাণে তাঁর প্রশ্নাতীত পারদর্শীতা লক্ষ করা গেছে। সম্পাদনা করেছেন সমকালের শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্য পত্রিকা 'রামধনু'র। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরে তাঁর জীবনপ্রবাহে পূর্ণচ্ছেদ পরায় বাংলা কিশোর সাহিত্য ভবিষ্যতের একজন বলিষ্ঠ লেখককে হারিয়েছে। তবুও স্বল্প আয়ুষ্কালের মধ্যেই তিনি যা রচনা করেছেন, তা নেহাত তুচ্ছ নয়। বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যের সুবর্ণযুগে তাঁকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। বরং তিনি নিজস্ব গাল্পিকভুবনের জন্যই অকালপ্রয়াত বিরলপ্রতিভার স্বীকৃতি পেয়েছেন। সমকালীন হেমেন্দ্রকুমার রায় মনোরঞ্জন সম্পর্কে তাই সশ্রদ্ধচিত্তে জানিয়েছেন, ' দেখা পেয়েছি দু'দিন, মনে রাখব চিরদিন।'

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে (১৩১০ সালের ২৭ শে কার্তিক) জলপাইগুড়ি জেলার মামাবাড়িতে মনোরঞ্জন জন্মগ্রহন করেন। পিতা বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য কর্মসূত্রে ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বদলির চাকরি হাওয়ায় বিশ্বেশ্বরকে বাংলার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ছুটতে হত। মনোরঞ্জন অল্পবয়সেই ফরিদপুর, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর, কোলকাতার বিভিন্ন জায়গায় থাকারসূত্রে পরিচিত হয়েছিলেন বিভিন্ন মানুষজনের সঙ্গে। তাঁর গল্পে পরবর্তীকালে এই অভিজ্ঞতার সঞ্চার লক্ষ করা যায়। কোলকাতার হিন্দুস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ.পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। কর্মজীবনে তিনি প্রবেশ করেন অধ্যাপনার মাধ্যমে। রিপন কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপকরূপে তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন। এই সময় ছোটদের জন্য একটি আদর্শ পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তিনি। প্রকাশিত হয় (১৯২৭, মাঘ) 'রামধনু' পত্রিকা। 'রামধনু'র প্রথম সম্পাদক ছিলেন মনোরঞ্জনের পিতা বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য। দু'বছর পর 'রামধনু'র দায়িত্ব গ্রহণ করেন মনোরঞ্জন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত (১৯৩৯, ২১ শে মাঘ) দীর্ঘ নয়বছর তিনি 'রামধনু'র সম্পাদনা করেছেন।

'রামধনু' পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে মনোরঞ্জন ছোটদের জন্য লেখা শুরু করেন। ছোটদের জন্য লেখা হলেও তাঁর লেখাগুলি শিশুসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত নয়। কেননা, 'মনোরঞ্জনের গল্পকাহিনিতে একটি পরিচ্ছন্নবুদ্ধিবাদ স্পষ্ট দেখা যায়।'[৩৬] তাঁর কাহিনির চমৎকারিত্ব উপলব্ধি করা শিশুদের পক্ষে কষ্টকর। তুলনায় কিশোরদের পরিণত মননে মনোরঞ্জনের গল্পের আমেজ অনাবিল আনন্দ ছড়িয়ে দেয়। রহস্যকাহিনির সূত্রানুসন্ধান ও সত্যের ক্রমোন্মচন সম্পূর্ণতই কিশোরদের মনোজগতের বিষয়। তিনি ছোটদের জন্য রহস্য উপন্যাস লিখেছেন তিনটি— 'পদ্মারাগ' (১৯৩০), 'ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি', ও সোনার হরিন' (১৯৩৬)। ছোটদের জন্য লেখা রহস্য গল্পের সংখ্যা পাঁচটি— 'শান্তিধামে অশান্তি', 'হীরক-রহস্য', ' তেরোনম্বর বাড়ির রহস্য', 'সংসক্তপুরের রহস্য', এবং চণ্ডেশ্বরপুরের রহস্য'। রহস্যগল্পগুলি ছাড়াও ছোটদের জন্য লেখা মনোরঞ্জনের বইগুলি

হল,— 'গল্প-স্বল্প' (১৯৩০), 'চায়েরধোঁয়া' (১৯৩০), 'এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে', 'ছুটির গল্প' (১৯৩৩) , 'চ্যানিংস' (১৯৫৩), 'নূতনপুরাণ' (১৯৬২), 'দমাদম দামোদর' (১৯৪৭), 'হাস্য ও রহস্য'।

(২)

প্রথমপর্বের বাংলা রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনির লেখকরূপে মনোরঞ্জন একসময় পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। মনোরঞ্জনের পূর্বেই কিশোরপাঠ্য গোয়েন্দা কাহিনি বাংলাদেশে অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। দীনেন্দ্রকুমার রায়, বাংলায় কিশোরপাঠ্য রহস্যগল্পের প্রথম সার্থক লেখক। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'নন্দনকানন' পত্রিকা ও সিরিজ, দীনেন্দ্রকুমারের 'রহস্যলহরী' সিরিজ কিংবা মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের 'রোমাঞ্চ' পত্রিকার দৌলতে বাংলার কিশোর পাঠক পেয়েছে অবিস্মরণীয় কিছু গোয়েন্দা কাহিনি। মি.ব্লেক , জয়ন্ত মানিক, ব্যোমকেশের মতো সত্যসন্ধানীরা বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এঁদের মধ্যেই বিরল ব্যতিক্রম মনোরঞ্জন। তিনিই প্রথম বাংলা গোয়েন্দাগল্পে সূত্রানুসন্ধানের কাজে প্রখর পর্যবেক্ষণ শক্তির সার্থক ব্যবহার করেছেন। তাঁর 'হুকা-কাশি' বাঙালি না হয়েও পর্যবেক্ষণ শক্তির অদ্ভুতগুণে বাংলাদেশের অপরাধীদের অপরাধের তত্ত্বতলাশ করেছেন। গোয়েন্দা 'হুকা-কাশি' মনোরঞ্জনের আশ্চর্য সৃষ্টি। তাঁর তিনটি রহস্য উপন্যাস 'পদ্মরাগ', 'ঘোষ চৌধুরীদের ঘড়ি', 'সোনার হরিন' এবং পাঁচটি রহস্যগল্পে হুকাকাশির অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ শক্তি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতার সন্ধান পাওয়া যায়।

মনোরঞ্জনের হুকাকাশি জন্মসূত্রে জাপানি। বিদেশি হলেও বাংলার জল-হাওয়ায় লালিত হুকা-কাশি আদ্যন্ত বাঙালি যুবক। পর্যবেক্ষণ শক্তি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতায় সে পৃথিবীর প্রথম শ্রেণির গোয়েন্দা। ছদ্মবেশ ধারণেও তাঁর অসামান্য পটুত্ব। 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে রণজিৎ প্রথমে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছিল—

> *" যে কাজে আমরা হাত দিতে যাচ্ছি, তাতে কৃতকার্য হতে হলে আমাদের সর্বদাই নিজেদেরকে গোপন করে চলতে হবে। হুকাকাশি জাপানি লোক, সে কি ঠিক পারবে এই বাঙালির রাজ্যে নিজেকে গোপন করে চলতে? . . . অমন খাসা চ্যাপ্টা নাকটা, থ্যাবড়া মুখখানা আর মিটমিটে চোখ দুটো— এ সে লুকোবে কোথায়?"*

পরমুহূর্তেই রণজিতের এই ভ্রান্তি দূর হয়েছিল। তাঁর সামনের বাঙালি ভদ্রলোকটি ছদ্মবেশ খুলতেই রণজিৎ সবিস্ময়ে দেখল, এতক্ষণ বাঙালি ভেবে সে যার সঙ্গে নিশ্চিন্তে কথা বলছিল, সেই আসলে 'একজন স্বাস্থ্যবান জাপানি ভদ্রলোক'। রণজিৎ পরবর্তী সময়ে হুকা-কাশির অ্যাসিস্টেন্ট বা সহকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

হুকা-কাশিকে নিয়ে লেখা কাহিনিগুলির মধ্যে দুটি বিষয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রথম, হুকা-কাশির চরিত্র; এটি আশ্চর্য রকমের জীবন্ত চরিত্র। দ্বিতীয়, ক্ষুরধার বুদ্ধির দ্বারা লেখক যেভাবে প্যাঁচের পর প্যাঁচ রচনা করেছেন এবং সূত্রের পর সূত্র বিশ্লেষণ করে রহস্যের সমাধান করেছেন— তা এই গল্পগুলিকে অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছে।'[৩৭] রহস্য উন্মোচনের জন্য আপাতভাবে অতিতুচ্ছ বিষয়ও যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, মনোরঞ্জন সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে সামসেরপুরের জমিদার রায়বংশের কৌলিক সম্পদ 'পদ্মরাগ' মণিটি চুরি গেলে হুকা-কাশি একটি পেন্সিলকাটারের সাহায্যে অপরাধীকে শনাক্ত করে। এই সূত্রসন্ধানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লেখক হুকা-কাশির অসামান্য পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন—

> *"এতলোক থাকতে দিবেনবাবুর ওপর সন্দেহ কি করে পড়ল, এইবার বলছি শুনুন। . . শ্রীমন্ত হঠাৎ জেগে ওঠায় তিনি পদ্মরাগ নিয়ে হুড়মুড় করে পালাবার সময়ে যে পেজ কাটারটা দিয়ে কাচের দরজা খুলে ঘরে ঢুকেছিলেন, সেটি সঙ্গে করে নিয়ে যাবার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন।. . . সুন্দর বহুমূল্য পেজকাটারটি, হাড়ের বাঁটের বলে প্রথমে মনে হলেও আসলে সেটি হাতির দাঁতের। ওরকম পেজকাটার কেনা যার তার কর্ম নয়—বুঝলাম এর মালিক খুব ধনী ও বিশেষ সৌখিন। হ্যাণ্ডেলের ওপর মালিকের নাম লেখাছিল। যদিও ঠিক সেই জায়গাতেই ভেঙেছে, তবুও তার নাম বুঝতে কষ্ট হল না,— 'ডি'। চমকে উঠলাম, তবে কি এটা দিবেনবাবুর কিংবা দীপেনবাবুর? . . . লোক যেই হোক না কেন, সময়ে তার পেজকাটারটার কথা মনে পড়বেই এবং সেটা নিয়ে যাবার জন্যে গোপনে রাজাবাহাদুরের ঘরে খোঁজাখুঁজি সে করবেই।"*

'ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি' গল্পে নলকোপার জমিদার বংশের ভূপেশনাথ চৌধুরীর পিতৃ-স্মৃতি চিহ্ন চুরি যাওয়া ঘড়ির অনুসন্ধানে নেমে হুকা-কাশি পৌঁছেযান অন্য এক রহস্যের গভীরে। প্রফেসর গঙ্গাধর গুপ্তের দীর্ঘ দিনের গবেষণালব্ধ রেয়ার আর্থমেটাল চুরি করেছিল তারই ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট বীরূপাক্ষ্য আচার্য। বীরূপাক্ষ তা লুকিয়ে রেখেছিল ঘোষচৌধুরীদের ঘড়ির ভেতর। হুকা-কাশির বিচক্ষণতায় শেষ পর্যন্ত উদ্ধার হয় সেই বহুমূল্য আর্থমেটাল।

মনোরঞ্জনের লেখা পাঁচটি রহস্যগল্পের গোয়েন্দাও হুকা-কাশি। 'শান্তিধামের অশান্তি'তে ঘটনার ঘনঘটা নেই। তামিলনাড়ুর সীমান্ত প্রদেশে ভ্রমণে গিয়ে একটি রহস্যময় বাড়ির রহস্যভেদ করে হুকা-কাশি। সেই ভুতুড়ে বাড়ির আসলভূত যে প্রতিবেশী বেঙ্কটচারীর লোকজন, তা আবিষ্কার করেছে হুকা-কাশি। বেঙ্কটচারীর 'মাটির দরে' বাড়িটি কিনে নেওয়ার ফিকির ধরা পড়ে যায়। 'তেরোনম্বর বাড়ির রহস্য' গল্পে কাম্বোলির মিউজিয়াম থেকে চুরি যাওয়া ষোড়শ শতকের একছড়া মুক্তোর মালা উদ্ধার করে হুকা-কাশি। চুরির ধরণটি অতিসাধারণ-কিন্তু অসাধারণও। চোর মালাটি গিলে ফেলেছিল। পেটের যন্ত্রণায় তার চিৎকারই তাকে শেষ পর্যন্ত রণজিৎদের নজরে আনে।

"তার সেই রোগীটি অহস্য ব্যথায় দিনরাত পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছে, অথচ সে ব্যথার কারণ ঘুণাক্ষরেও কারও কাছে প্রকাশ করার উপায় নেই, . .এখানে হাজার কাজের মধ্যেও এলোকটা বসে বসে চিকিৎসা শাস্ত্রের বই পড়ছে— নানারকম জোলাপ সম্বন্ধে। ওষুধটা যখন জোলাপ, ব্যথাটা নিশ্চয়ই পেটের। পেটের ব্যথার সঙ্গে কোনও জিনিস চুরির একমাত্র সম্বন্ধ থাকতে পারে যদি চোরাই মালটা হয় খুব ছোটো, আর চোর সেটাকে গিলে ফেলে থাকে। কি অবস্থায় মুক্তোর মালা চুরি হয়েছিল কিউরেটার তা বলেছিলেন, শুনে আর কোনও সন্দেহ রইল না যে আপনার প্রতিবেশী ওই তেরো নম্বরের ভাড়াটেই মালা চোর —চুরির পরেই বেগতিক দেখে সে সেটা গিলে ফেলেছে।"

এইভাবেই উদ্ধার হয় চণ্ডেশ্বরপুরের মরকতমণি, ('চণ্ডেশ্বরপুরের রহস্য'), সেন জুয়েলাস থেকে চুরি হওয়া হীরে ('হীরক রহস্য')।

মনোরঞ্জনের গোয়েন্দাগল্পে খুনজখমের কোন ঘটনা ঘটে না। তবে কাহিনিতে আদ্যোপান্ত লেখক একধরণের উত্তেজনা ছড়িয়ে দেন। ছোটদের জন্য লেখা বলেই তাঁর রহস্যকাহিনিতে জটিলতা বর্জন করেছেন। সূত্রান্বেষণের অহেতুক মারপ্যাঁচ কাহিনির গতিকে রুদ্ধ করেনি। কাহিনির শেষে চমক থাকে। তবে প্রথম পর্বের লেখা বলেই সম্ভবত মনোরঞ্জনের গল্পে কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। রহস্যের সূত্রগুলির ব্যাখা সবসময়ই যে বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে, এমন নয়। যেমন 'সোনার হরিণ'-এর অহিভূষণের অফিসে পাওয়া খাতায় 'd' লেখার বিষয়ে কিংবা রণজিৎকে ভাল্লুক সাজিয়ে রাখার বিষয়ে পাঠককে পূর্বে সচেতন করা হয়নি। এই সমস্ত সামান্য 'টেকনিক্যাল' ভুল উপেক্ষা করলে মনোরঞ্জন যে প্রথমযুগের বাংলা রহস্যগল্পের অন্যতম সফল লেখক, সে বিষয়ে সংশয় থাকে না। বিশেষত, মনোরঞ্জন সৃষ্ট গোয়েন্দা হুকা-কাশি সমকালে অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। হুকা-কাশিকে অনুসরণ করে কল্কে-কাশি নামে অন্য এক গোয়েন্দা চরিত্র সৃষ্টি করেছেন শিব্রাম। হুকা-কাশির আদলে শিবরামের এই গোয়েন্দা সৃষ্টি, হুকা-কাশির জনপ্রিয়তারই পরিচায়ক।

(৩)

গোয়েন্দা গল্পের পাশাপাশি মনোরঞ্জন ছোটদের জন্য লিখেছেন বেশ কিছু সরস গল্প। গল্পগুলির অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছে 'রামধনু' পত্রিকাতে। পরে এই গল্পগুলি প্রকাশিত হয় 'গল্প-স্বল্প' (১৯৩০), 'এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে', 'ছুটিরগল্প' (১৯৩৩), 'চ্যানিংস' (১৯৫৩), 'নূতন পুরাণ' প্রভৃতি গ্রন্থে। 'চ্যানিংস' বইটির গল্পগুলি Mrs. Henry Wood এর 'the channings' অবলম্বনে লেখা। 'এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে' বইটি যুগ্মভাবে লেখা। মনোরঞ্জন এবং শিব্রাম চক্রবর্তীর তিনটি করে গল্প ঠাঁই পেয়েছে এই গ্রন্থে। মনোরঞ্জনের গল্পগুলি বিষয় ও আঙ্গিকগত দিক থেকে নব্যপন্থী। পুরাতনী নীতিকথার জগৎ কিংবা নীতিকাহিনির মাধ্যমে চরিত্রগঠনের বিশেষ প্রবণতা তিনি বর্জন

করেছেন। তুলনায় তিনি কাহিনিরূপে বেছে নিয়েছেন হাস্যরসের বিষয় কিংবা বাস্তব পৃথিবীর সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ। কখনও কখনও রোমহর্ষক ভৌতিক পরিবেশ বা রোমাঞ্চকর শিকারকাহিনিও তিনি উপহার দিয়েছেন।

মনোরঞ্জনের অভিনব সংযোজন পৌরাণিক কাহিনির রূপান্তর। ইতিপূর্বে অবনীন্দ্রনাথ বা সুকুমার ছোটদের মতো করে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি পরিবর্তন ঘটিয়ে পরিবেশন করেছিলেন। কিন্তু মনোরঞ্জনের পুরাণের জগৎ অদ্বিতীয়। সেখানে দেব-দৈত্য-রাক্ষস-মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। 'মঙ্গলপুরাণ'-এ চিরশত্রু কৌরব-পাণ্ডবদের শত্রুতার দিন শেষ। কেননা—'লীগ অব নেশনস ভীমার্জুনের উপর নোটিশ জারি করিয়া দিয়াছে, পিকনিকের উদ্দেশ্যে দু'চারটা পাখি-টাখি তাঁরা মারেন তো স্বতন্ত্রকথা, কিন্তু যুদ্ধের জন্য গাণ্ডীবে টঙ্কার, অথবা গদা লইয়া হুঙ্কার দিলেই তারা স্রেফ হাঙ্গার-স্ট্রাইক করিয়া বসিবে। অতগুলি লোক যদি সত্য সত্য না খাইয়া মারা পড়ে, সেইভয়ে ধর্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির গাণ্ডীব নিয়া একেবারে হস্তিনাপুর ব্যাঙ্কে জমা দিয়া দিয়াছেন।' (মঙ্গলপুরাণ) এমন কি স্বর্গের রাজবৈদ্যরাও কর্মশূন্য হয়েপড়েছেন 'দেবাসুরের সন্ধি'র জন্য। (বৈদ্যপুরাণ) মনোরঞ্জনের পৌরাণিক জগতে মেঘনাদ 'ইন্দ্রজিৎ' উপাধি লাভ করেছে দেবরাজ ইন্দ্রকে লনটেনিস খেলায় পরাজিত করে (লঙ্কাকাণ্ড); আধুনিক লঙ্কায় বসে বিশ্বব্রম্ভাণ্ডিক্ বা অলিম্পিক প্রতিযোগিতার আসর ('ইয়াঙ্কি পর্ব'), কিংবা দুর্যোধনের 'ওয়ার্থলেস মণি' উদ্ধারের জন্য পাণ্ডবপক্ষের ভীমের উদ্যোগে মঙ্গলগ্রহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে হনুমান।

এইগল্পগুলির প্লটনির্মাণে লেখব অসম্ভব মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। কাহিনির অভিনবত্ব পাঠককে মোহিত করে রাখে। কাহিনির শেষে একধরণের অনভিপ্রেত চমক পাঠককে মুগ্ধ করে। 'মঙ্গলপুরাণ'-এর সূচনা ঘটেছে নারীর সহজাত ইর্ষা থেকে। কিরকম ঈর্ষা—পাণ্ডব পক্ষের সেজবৌ সুভদ্রার স্যমন্তক মণি দেখে দুর্যোধনের স্ত্রীর বুকে 'শূলের ব্যাথা' ধরল। কৌরভালজে দুর্যোধনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসে পাণ্ডবপক্ষ। সুভদ্রা আসে স্যমন্তক মণি বুকে ঝলিয়ে। সেই মূল্যবান মণি দেখেই 'দুর্যোধনের স্ত্রীর বুকে শূলের ব্যথা ধরিল। ভীমনাগের ভালো ভালো সন্দেশগুলি তাঁর মুখে লাগিল ঠিক কুইনিনের মতো বিস্বাদ।' এই খবর শুনে মানিলোক 'দুর্যোধন' স্ত্রীকে কথা দিলেন স্যমন্তক মণির মতো মূল্যবান মণি তিনি খরিদ করে আনবেন। সূচনার এই মণিবৃত্তান্তের সন্ধান করতে করতেই পাঠক গল্পের শেষে চমকে ওঠে। কেননা 'ওয়ার্থলেসমণি'র খোঁজে দুর্যোধনের ভাই দুঃশাসন দলবল নিয়ে মঙ্গলগ্রহে পৌছালে তাঁদের বন্দী করা হয়। হনুমান মঙ্গলগ্রহে পৌছে দেখেন, মঙ্গলগ্রহের চিড়িয়াখানায় খাঁচার ভিতর দুঃশাসন বন্দী পশুর জীবন কাটাচ্ছে। দুঃশাসন বলে—

> *"আমরা এসেছিলাম বুদ্ধিমান জীব ভেবে পৃথিবী থেকে এদের সঙ্গে আলাপ করতে আর এরা আমাদের অদ্ভুত কোন জীব ঠাউরে চিড়িয়াখানায় পুরে রেখেদিয়েছে। রোজ হাজার হাজার দর্শক এসে আমাদের দেখে যাচ্ছে।*

আমরা যত আসল ব্যাপার বোঝাতে যাই, ওরা ততই খিলখিল করে হাসে,
আর লম্বা লম্বা লাঠি দিয়ে আমাদের পেটে খোঁচা মারে।''

চিড়িয়াখানায় বন্দী পশুদের উপর মানুষ এভাবেইতো উৎপীড়ন করে। মনোরঞ্জন ছোটদের সচেতন করতে চেয়েছেন এই বিষয়ে। এই গল্পে লেখকের সচেতন দৃষ্টিতে আরও ধরা পড়েছে পৃথিবীব্যাপী খনিজতেলের অপব্যবহারের বিষয়, বুদ্ধিমান প্রাণীদের শারীরিক কসরতের পরিবর্তে মস্তিষ্ক-সর্বস্ব জীবন। মঙ্গলগ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীরা ফুটবলের মতো। কেননা 'অনবরত কেবল মাথার কাজ করিতে করিতে লক্ষ লক্ষ বছর পরে এখন মাথাটাই তাদের বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, শরীরের অন্যান্য অংশ নাই বলিলেই চলে।'

'ঢেকিবাহনের কলঙ্কভঞ্জন' কিংবা 'ইয়াঙ্কিপর্ব'র গল্পগুলির শেষও যথেষ্ট চমক। প্রথমগল্পটিতে রাক্ষস ও দৈত্যদের মধ্যে যুদ্ধের উপক্রম বাধে একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে। রাবণের রাণী মন্দোদরী তাড়কাব্রত উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য একটি ভোজসভার ব্যবস্থা করে। রাবণরাজের দূত স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে নিমন্ত্রণ পত্র নিয়ে ছুটলো। ভোজসভায় রাবণ বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানালেন দৈত্যদের। কিন্তু দৈত্যরাজ বৃত্রাসুরের একটি চিঠি মহাঅনর্থ বাঁধাল। রাবণের দূত লঙ্কায় ফিরে এল একটি কচিপাঁঠাকে নিয়ে, পাঠাটির গলায় লেখা 'রাবণ'। তার হাতের চিঠিতে দৈত্যরাজ রাবণকে জানিয়েছেন—

''শুনিয়াছি আপনি আস্ত পাঁঠা। খাইতে নাকি বড়ই সুস্বাদু। মনেকরেন,
আমি আপনার যম। জবাই ছাড়া আর কিছুই না— দৈত্যদের সঙ্গে রাক্ষসদের
উহা ছাড়া আর কোনই সম্পর্ক থাকিতে পারে না। আমরা মনে করি আপনি
ক্ষুদ্র জীবটি। অল্প আঁচে পোড়াইয়া খাইলে আমার নিজের বড়োই তৃপ্তি
হইবে এবং আমার অধীনস্থ দৈত্যগণও বিশেষ পুলকিত হইবে।''

বৃত্রাসুরের এই অপমানজনক চিঠি পেয়ে রাবণ উত্তেজিত হয়েপড়লেন। রাক্ষসপার্লামেন্ট সিদ্ধান্ত হলো রাক্ষসবাহিনি দৈত্যপুরী আক্রমণ করবে। এই কাহিনিটির চমৎকার সমাপ্তি ঘটেছে দেবর্ষি নারদের উপস্থিতিতে। নারদ লঙ্কানরেশের কাছে সম্পূর্ণ বিষয়টি অবগত হয়ে সেই পত্রটি দেখতে চাইলেন। তারপর তিনি পত্রের উপর পেন্সিল ও রাবার ঘষে পত্রটি দিলেন রাবণের হাতে। রাবণ দেখল পত্রে লেখা আছে—

''শুনিয়াছি আপন আস্ত পাঁঠা খাইতে নাকি বড়ই সুস্বাদু মনে করেন। আমি
আপনার যমজ বাই (ভাই) ছাড়া আর কিছুই না— দৈত্যদের সঙ্গে রাক্ষসদের
এছাড়া আর কোন সম্পর্কই থাকতে পারে না, আমরা মনে করি। আপনি
ক্ষুদ্র জীবটি অল্প আঁচে পোড়াইয়া খাইলে আমার নিজের বড়োই তৃপ্তি হইবে
এবং আমার অধীনস্থ দৈত্যগণও বিশেষ পুলকিত হইবে।''

চিঠির এই অর্থবিভ্রাটের কারণ যে, দৈত্যদের দুর্বল ব্যাকরণজ্ঞান সেকথা জানিয়ে নারদ বলেছে—'বৃত্র আবার আর এক পণ্ডিত তার জানা আছে লেখার মধ্যে কতগুলো দাঁড়ি, কমা থাকে— কাজেই বিদ্যে ফলাবার জন্যে যেখানে সেখানে কতগুলো দাড়ি, কমা,ড্যাশ বসিয়ে চিঠিতে সই করেছে।' বিবাদ বাঁধাতে ওস্তাদ নারদ রাক্ষস-দৈত্যদের মধ্যে যুদ্ধ থামিয়ে তাঁর কলঙ্ক ভঞ্জন করলেন। তাই গল্পের নাম 'ঢেঁকিবাহনের কলঙ্কভঞ্জন।'

'ইয়াঙ্কিপর্ব' গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে বিশ্বব্যাপী অলিম্পিক প্রতিযোগিতা। 'চার বচর অন্তর অন্তর স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল-তিনমহাদেশের ভিন্নভিন্ন জাতিদের মধ্যে একবার ব্রাহ্মণ্ডিক প্রতিযোগিতার আসর বসতো। রাবণের ইচ্ছে প্রতিযোগিতা যেন একবার লঙ্কাতে অনুষ্ঠিত হয়। কেননা রাবণ লক্ষ করেছিলেন যে অলিম্পিকের উদ্বোধকের 'সে কি সম্মান!' অবশেষে রাবণের উদ্যোগে লঙ্কা পেল ব্রাহ্মণ্ডিক প্রতিযোগিতা আয়োজনের ভার। ''ব্রাহ্মণ্ডিক উৎসবের ঠিক আগের দিন, লঙ্কাপুরীর সে দৃশ্য বাস্তবিকই বর্ণনাতীত। অফিস-কাছাড়ি, ইস্কুল-কলেজ সমস্ত বন্ধ, দলে দলে সুসভ্য রাক্ষসেরা মহাব্যস্তভাবে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সমুদ্রের পাড়ে বিরাট স্টেডিয়াম উঠিয়াছে, তাতে লক্ষ লক্ষ দর্শকের আসন।'' চারিদিকে উৎসবের আমেজ। কিন্তু এরই মাঝে গোল বাধল কুম্ভকর্ণকে নিয়ে। অকালে তার ঘুম ভেঙে গেছে। এখুনি প্রয়োজন তার প্রিয়খাদ্য 'হাতির রস', 'গণ্ডার-ভাতে।' রাবণ কুম্ভকর্ণর ঘরে গিয়ে দেখলো—'সামনেই একটা চাকর রাক্ষস মূর্ছা খাইয়া পড়িয়া আছে—সে জোচ্চর নাকি হাতির রসের নাম করিয়া খানিকটা ছাগল রস আনিয়া দিয়াছিল; এক চুমুক খাইবার পরই কুম্ভকর্ণ তার কানের ডগায় মারিয়াছে একঘুষি।' ক্ষুধার্ত কুম্ভকর্ণ সমুদ্রের পাড়ের একজিবিশনের দিকে ছোটে খাবারের গন্ধ পেয়ে। রাবণ রাজের চুল ছেঁড়ার উপক্রম। কেননা অসভ্য বর্বর কুম্ভকর্ণের দৌলতে তার সাধের ব্রাহ্মণ্ডিক প্রতিযোগিতা দফরফা হতে বসেছে। শেষ পর্যন্ত হবসনের আয়নায় নিজের বিকট প্রতিচ্ছবি দেখে কুম্ভকর্ণ শান্ত হয়।

এই গল্পে কুম্ভকর্ণের বিচিত্র খাদ্যাভ্যাসের উল্লেখ রয়েছে। তার প্রিয়খাদ্য হাতির রস, আর গণ্ডার-ভাতে। 'আস্ত হাতিটিকে আদার রসে বেশ কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিতে হইবে, তারপর তাকে ছেঁচিয়া বাদাম, কিসমিস, পেস্তা মিশাইয়া মিহি ন্যাকড়ায় ছাঁকিতে হইবে। এই হইল বাবুর একনম্বর পেয়ারের খাবার।' অবশ্য কুম্ভকর্ণের আরেকটি প্রিয়খাবারের সন্ধান পাওয়া যায় 'ঢেঁকিবাহনের কলঙ্কভঞ্জন' গল্পে—'বাঘভাজা'। 'বেসম গোলায় বাঘটিকে এপিট-ওপিঠ ডুবিয়ে নিয়ে গরম ঘিয়ের কড়ায় ছাড়তে হবে, বেশ মচমচে হলে'নামিয়ে নিতে হয়। 'একটু মৌরিভাজা কিম্বা পাঁচফোড়ন গোলার ভেতর দিলেও হয়-না দিলেও ক্ষতি নেই।'

মনোরঞ্জনের পৌরাণিক আখ্যানে আশ্চর্য চারিত্রিক রূপান্তর ঘটেছে পুরাণের প্রসিদ্ধ মনীষীদের। দেবতা-রাক্ষসদের মধ্যে বৈরীতার সম্পর্ক নেই আর। অসভ্য বর্বর রাক্ষসজাতির পরিবর্তন ঘটেছে। তারা সুসভ্য হয়েছে। লঙ্কেশ্বর রাবণ ইদানীং কৃপণ হয়ে পড়েছেন। 'গাঁটের পয়সা বড়ো সহজে বাহির করিতে চান না। তাঁহার সাবেক আমলের তৈরি লঙ্কাস্থ বাড়িটা ছিল

আগাগোড়া সোনায় মোড়া, লোকে তাহার বর্ণনা দিতে গিয়া বলিত, 'স্বর্ণপুরী লঙ্কা', রাজা এখন তার সমস্ত সোনা তুলিয়া ব্যাঙ্কে জমা দিয়াছেন।' তার নেশার বস্তু বিড়ি। এমনকি খুশি হয়ে তিনি থমসনকে উপহারও দিয়েছেন বিড়ি। কৃপণ হলেও তিনি সংস্কৃতি-মনস্ক। অ্যারিস্টোক্রেসির জাতে ওঠার জন্য অলিম্পিক প্রতিযোগিতার আয়োজনে ইচ্ছুক। স্বর্গ-মত্য-পাতালের পরিবর্তন ঘটলেও রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণ একইরকম থেকে গেছে। রাবণ মাঝে মাঝে দুঃখ করেন, ''বিধাতা তো আমায় কোনও জিনিসই দিতে কার্পণ্য করেননি— কেবল একটি হস্তিমূর্খ ভাই দিয়েই সব মাটি করে রেখেছেন। চলমান জগতের কোন খবরই রাখে না—একটা আস্ত রিপ ভ্যান উইঙ্কল।' পরিবর্তন ঘটেছে দৈত্যদেরও। বৃত্রাসুর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ হাজার ব্রাহ্মণ বালকের বিদ্যাশিক্ষার জন্য বৃত্তির অনুদান প্রদান করেন। বৃত্রের সহকারী মৎসাসুরের চারিত্রিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গীয় ভাষা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। গোয়ালন্দে কাটানোর জন্য 'ধানকে' সে বলত 'দান', ভাতকে বলত 'বাত'। এই মৎসাসুরই 'ঢেঁকিবাহনের কলঙ্কভঞ্জনে'র বিখ্যাত চিঠিটি লিখেছিল।

শব্দ ও সংলাপ দিয়ে মনোরঞ্জন কৌতুকের আবহ তৈরি করেছেন। লঙ্কার সংবাদের নাম 'কাঁচালঙ্কা'। 'লঙ্কার কাঁচা অর্থাৎ 'তরুণ বয়সের রাক্ষসরা' এই কাগজ প্রকাশ করে বলে পত্রিকার এরূপ নামকরণ। ইন্দ্রের পুষ্পকরথ মনোরঞ্জনের লেখনিতে 'দি পুষ-পাক'-এ রূপান্তরিত। যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের রাজা হয়েই শহরের নতুন নামকরণ করেন 'হস্তি-হাঁ-পুর'। কেননা যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ। তাঁর রাজত্বে মিথ্যের কোনো প্রশ্রয় নেই। তিনি লক্ষ করলেন হস্তি-না-পুরের প্রায় সমস্ত বডোলোকেরা হাতি বা হস্তীতে সওয়ারী করে। 'শহরে হস্তী থাকিবে অথচ নাম হইবে হস্তি-না-পুর'। এ যে মিথ্যে কথার চূড়ান্ত'। তাই যুধিষ্ঠির শহরের নাম বদলে রাখলেন 'হস্তি-হাঁ-পুর'। কিষ্কিন্ধ্যা নগরে ভীম তাঁর ধর্মদাদা হনুমানকে খুঁজতে গিয়ে শুনলেন হনুমান 'কলাভবনে' আছেন। ভীম 'কলাভবন' শুনে ভাবলো হনুমান বুঝি ছবি আঁকার নেশায় মজেছে। তাই পথিক বানরটি যখন ভীমকে জানায় সে কোন কলাভবনের কথা জানতে চায়—কাঁচা, ডাঁশা না পাকা; তখন ভীমের সংশয়ে দেখা দেয়— তাঁর দাদা 'পাকা আর্টিস্ট, না ডাঁশা আর্টিস্ট, না কাঁচা আর্টিস্ট।'

সূক্ষ্মরসবোধ, বর্ণনার চমৎকারিত্ব এবং কাহিনি পরিবেশনে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়কে কৌতুকরসে জারিত করে মনোরঞ্জন তাঁর গল্পকে উচ্চশ্রেণির রসসাহিত্যে পর্যবসিত করেছেন। পরিমাণগত দিক থেকে স্বল্পসংখ্যক হলেও উৎকর্ষতার দিক থেকে মনোরঞ্জনের গল্পগুলি প্রথম শ্রেনির। তাই সমকালীন ও পরবর্তী যুগের লেখকরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন মনোরঞ্জনের দ্বারা। বাংলা কিশোরসাহিত্যে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য তাই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বিরল, ব্যতিক্রমী স্রষ্টারূপে।

পাদটীকা :

১. মানবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ : শিশুসাহিত্য, পৃ: ৩৭

২. 'বালক' পত্রিকায় পূর্ব প্রকাশিত ছয়টি কবিতা 'শিশু'তে সংকলিত হয়েছে

৩. মানবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ : শিশুসাহিত্য

৪. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, রবীন্দ্র শিশুসাহিত্য পরিক্রমা

৫. রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি

৬. রবীন্দ্রনাথ 'ছড়ার ছবি'র ভূমিকায়, ছড়ার অর্থ বুঝতে না পারলেও ছোটরা যে ছড়ার ধ্বনি ও ছন্দ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে, তা জানিয়ে লেখেন—'ছেলে মেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে'

৭. ইতিমা দত্ত, রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য ও শিশু চরিত্র, পৃ: ৭৩

৮. মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ : শিশুসাহিত্য

৯. আশা গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্রমবিকাশ

১০. নবেন্দু সেন, বাংলা শিশুসাহিত্য, তত্ত্ব তথ্য, রূপ ও বিশ্লেষণ

১১. বিজন বিহারী ভট্টাচার্য, যোগীন্দ্রনাথ সরকার শতবার্ষিকী স্মরণীকা

১২. ব্রততী চক্রবর্তী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার—বাংলা শিশু সাহিত্য

১৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য, লোক সাহিত্য (২য় খণ্ড)

১৪. অজিত কুমার দত্ত, 'গ্রন্থ পরিচয়', 'অবনীন্দ্র সাহিত্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উপাদানের ব্যবহার

১৫. প্রমথনাথ বিশী, অবনীন্দ্রনাথ স্মৃতি

১৬. মলয় বসু, বাঙলা সাহিত্যে রূপকথা চর্চা

১৭. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিশুদের রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্র রচনাবলী

১৮. খগেন্দ্রনাথ মিত্র, 'শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলেছেন—'ক্ষীরের পুতুল মৌলিক রচনা, বাংলা সাহিত্যে নূতন সৃষ্টি।'

১৯. বিভিন্ন ধরণের ষষ্ঠীব্রত হতে পারে। যেমন—অরণ্যষষ্ঠী, চাপড়াষষ্ঠী, শীতলা ষষ্ঠী, লোটন ষষ্ঠী। সাধাবণত সন্তান কামনায় বা সন্তানের মঙ্গল কামনায় ষষ্ঠীব্রত করা হয়।

২০. ড. ঋদ্ধি দাশগুপ্ত, অবনীন্দ্র সাহিত্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উপাদানের ব্যবহার

২১. বিজিতকুমার ঘোষ, গ্রন্থপরিচয়, অবনীন্দ্র সাহিত্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উপাদানের ব্যবহার

২২. নবেন্দু সেন, বাংলা শিশুসাহিত্য তত্ত্ব, তথ্য, রূপ ও বিশ্লেষণ

২৩. সুকুমার সেন, অবনীন্দ্রনাথ ও আর্টের প্রভাব

২৪. রবীন্দ্রনাথ, ভূমিকা, 'ঠাকুরমার ঝুলি'

২৫. ঐ ঐ

২৬. রবীন্দ্রনাথ, বিজয়া সম্মিলন, ভারতবর্ষ ও স্বদেশ

২৭. বরুণকুমার চক্রবর্তী, শতবর্ষের পরেও আপনজন, পরশপাথর, সেপ্টেঃ ২০০৭

২৮. দেবাশিস মুখোপাধ্যায়, সুকুমার রায় : জীবনপঞ্জী, কোরক, বইমেলা সংখ্যা ১৪০৯

২৯. নবেন্দু সেন, বাংলা শিশুসাহিত্য তত্ত্ব, তথ্য, রূপ ও বিশ্লেষণ

৩০. বাংলা ছড়া ও কবিতাতে যোগীন্দ্রনাথ সরকার উদ্ভট সাহিত্যরসের প্রয়োগ করেন। গদ্যে উদ্ভট রসের পূর্ণ প্রকাশ লক্ষ করা যায় ত্রৈলোক্যনাথের রচনাবলীতে।

৩১. বুদ্ধদেব বসু, কবি সুকুমার রায়, বুদ্ধদেব বসুর রচনা সংগ্রহ (১ম খণ্ড)

৩২. সত্যজিৎ রায়, ভূমিকা, সমগ্র শিশুসাহিত্য : সুকুমার রায়

৩৩. সৌমিত্র বসু, সুকুমার রায়ের নাটক, কোরক, ১৪০৯

৩৪. ঐ

৩৫. ভূমিকা নাট্য সংকলন, সুর্নিমল বসু

৩৬. নবেন্দু সেন, বাংলা শিশুসাহিত্য; তত্ত্ব তথ্য রূপ ও বিশ্লেষণ

৩৭. সুখময় মুখোপাধ্যায়, ভূমিকা, ছোটদের অমনিবাস, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য